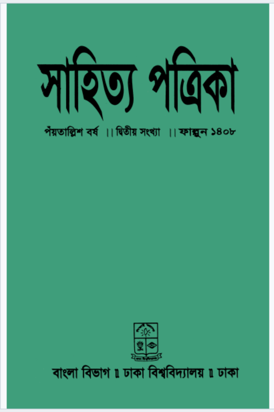

Vol. 45 | No. 2 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন

Volume	45
Issue	2
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নাসরিন আখতার
Published online	February 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.4
Pages	99-125
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন

নাসরিন আখতার*

বাংলা সাহিত্যের তৃণমূলস্পর্শী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ছোটগল্পের অভিনিবিষ্ট পাঠক সৃষ্টি ক'রেছেন মূলত বিষয়নৈপুণ্যে ও প্রকরণবৈচিত্র্যে। তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত মানুষ, সমাজ ও জীবনরহস্য বিচিত্রমুখী। তিনি শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টি ও স্রষ্টার করুণাঘন সহমর্মিতা দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছেন মানুষকে। সমাজের উচ্চকোটীর নরনারী ও পল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজের চলচ্ছবি বর্ণনার সমান্তরালে ব্রাত্য ও অন্ত্যজশ্রেণীর অজ্ঞাতপূর্ব ও অদ্ভুত চরিত্রের অসংখ্য মানুষ কেন্দ্রবর্তী অবস্থানে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর শিল্পীমানসের কেন্দ্রীয় বৃত্তভূমি প্রোথিত পল্লী প্রতিবেশে এবং জীবনবোধ-নিষিক্ত রাঢ়ভূমির সাধারণ জনমানুষের জীবনাচরণে। তিনি রাঢ়ের গ্রামজীবন সম্পৃক্ত মানুষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিতে তাদের দরিদ্র-জীবনের সীমাহীন অসহায়ত্ব, সংকীর্ণতা ও অস্তিত্বরক্ষার আত্মপীড়ন নানা মাত্রিক বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিকতায় উপস্থাপন ক'রছেন। সদর্থে সেটাই তাঁর ছোটগল্পের প্রেরণাভূমি। এভাবে 'তিনি হ'য়ে উঠলেন প্রত্যক্ষতঃ মাটি ও মানুষের শিল্পী, প্রবৃত্তি ও নিয়তির রূপকার।'[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে অনেকান্তে শিল্পপ্রমূর্তি লাভ ক'রেছে ব্রাত্যজীবন। পল্লীনিভৃত অন্ত্যজ, ব্রাত্য আদিবাসীদের নির্বিভেদ জীবনাচরণ ও মানসিকবোধ সমাজসত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব কথনকৌশলে নানারঙে সমৃদ্ধ। তাদের জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা, আকাঙ্ক্ষা-প্রাপ্তি, সংস্কার-কুসংস্কার, মিথ; যেমনঃ অজগর, সাপ, গাছ, পাখী ইত্যাদি টোটেম, বাস্তব-সহায়ক পটভূমিতে স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। টোটেম বলতে কোনো প্রাণী, গাছ, পাথর বা অন্যকিছুকে বুঝায়, যা আদিম মানুষের কাছে পূর্বপুরুষের প্রতিমূর্তি। ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়াও কিছু বিশ্বাস হিন্দুসমাজের ধর্মের অঙ্গ হিসাবে টিকে আছে। তার প্রমাণ 'ধ্বজা' পূজা। বংলাদেশে একাদশ শতকে ধ্বজা পূজা প্রচলিত ছিল। বিভূতিভূষণের আরণ্যক

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মাহতাবউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ

(১৯৩৯) উপন্যাসে এ পূজার উল্লেখ আছে।[২] প্রাচীন বাংলার আদিবাসীদের টোটেম বিশ্বাস হিসাবে এসেছে সাপ, গাছ, পাখী যা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলার কোনো কোনো সমাজে ধর্মবিশ্বাসপ্রসূত বৃক্ষ-পূজা এখনো চলে। প্রাচীন কালে এক একটি কৌমের ছিল এক একটি টোটেম। টোটেমগুলো পূজা পেত, যেমন ঃ সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর পেঁচা, মনসার সাপ, বিষ্ণুর বাহন গরুড় ইত্যাদি।[৩] তারাশঙ্করের গল্পে সাপ একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। আদিবাসী সাঁওতালদের সর্পবিশ্বাস, অন্ত্যজ জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের জীবনাচরণ, গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতায়, বাস্তব অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি সার্থকরূপ দিয়েছেন। তাই তারাশঙ্কর বিলীয়মান ঐশ্বর্যের জমিদারতন্ত্রের প্রতিভূ হ'লেও মৃত্তিকাসম্ভব মানবজীবন-ই তাঁর অন্বিষ্ট।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্য সমাজের অজ্ঞাত কুলশীল মানুষের মানবিক অনুভূতি, মানসিক বৈকল্য, অন্তর্যন্ত্রণা, নির্জিত অন্ত্যজ-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া-পরিবর্তন সমাজসম্ভব পটভূমিতে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে ফুটিয়ে তোলা। বাঙালী মানবসমাজের আদিস্তর যারা রচনা ক'রেছে, আর্থসামাজিক-সভ্যতার প্রসারের ফলে যারা সমাজবন্ধনের বাইরে অবজ্ঞাত, সভ্যতাভিমানী উচ্চমঞ্চের মানুষ যাদের দিকে মুখ তুলে তাকায়নি, তারাশঙ্কর সেই ব্রাত্য মানুষের কথাশিল্পী।[৪]

২

সামষ্টিক তথ্যনির্ভর উপস্থাপনায় বৈদিক সাহিত্যে সে যুগের যে তথ্যসূত্র পাওয়া যায়, সেখানে চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত শূদ্র অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ ব'লে পরিগণিত। সপ্তম ও অষ্টম শতকে রচিত চর্যাসাহিত্যে যে-সকল জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন— ডোম, চণ্ডাল, কাপালিক প্রভৃতি, তারা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য। কিন্তু বর্ণবিভাগ সম্পর্কে স্বয়ং মনুর ঘোষণায় গুণ ও কর্ম অনুযায়ী চারটি বিভাগের কথা উল্লেখ আছে। যেম--ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু যেহেতু শূদ্র আদি পুরুষের পা থেকে জাত, সে কারণে তাদের অবস্থান ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের দাসবৎ, অস্পৃশ্য নয়। শূদ্ররা ছিল মূলতঃ অপর তিনটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সেবক শ্রেণী। ক্রীতদাস অর্থে শূদ্ররা দাস ছিল ব'লে সমর্থন পাওয়া না-গেলেও বৈদিক যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূদ্রদের দাস-অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হ'য়েছে চূড়ান্তভাবে। বর্ণ বিভাজনের পরেই আছে সমাজে নানা বৃত্তিধারী মানুষের তালিকা। যেমন— রথকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, মণিকার, কৃষক, ধীবর, ব্যাধ প্রভৃতি। 'গোষ্ঠী হিসাবে আছে নিষাদ,

কিরাত, পর্ণক, বেন্দ ইত্যাদি। এরা সবাই শূদ্র নামের অন্তর্ভুক্ত।'[৫] অর্থনৈতিক দিক থেকে শূদ্ররা শ্রমজীবী শ্রেণী। গুপ্তযুগে এরা কিছু ধর্মীয় ও পৌর অধিকার অর্জন ক'রে। 'এ যুগে শূদ্ররা হস্তশিল্পী ও বণিকরূপেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে'। সময়ের বিবর্তনে শূদ্ররা অসম সামাজিক অবস্থানসম্পন্ন বহু উপবর্ণে বিভক্ত হ'য়ে প'ড়ে। সৎ ও অসৎ শূদ্রের মধ্যে বিভাজন গুপ্তযুগেই পরিলক্ষিত হয়। মনুর বিধানে শূদ্রদের পূর্বাপর সেবাদাস ব'ললেও সেখানে সবচেয়ে ঘৃণ্য চণ্ডাল। এরা শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে অন্ত্যজ এবং একেবারে অস্পৃশ্য ও অধিকার-বঞ্চিত। চণ্ডাল, স্বপাক ও অন্ত্যবসায়ীরা অপরাধীদের বধ করা ও শ্মশানের কাজে নিযুক্ত থাকত। বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিম্নবর্ণের হ'লেও শূদ্ররা অন্ত্যজ কিন্তু অস্পৃশ্য নয়। অসৎ শূদ্র ও মিশ্র জাত ব'লতেই অস্পৃশ্যদের বুঝায়। ধীবর, চণ্ডাল, পুক্কুস, স্বপাক, অন্ত্য প্রভৃতি এদের অন্তর্ভুক্ত। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিভক্তি আসা নিম্নবর্গের একটা বড় দুর্বলতা। এই বিভাগ প্রথম দেখা যায় পাণিনির সময়ে।'[৬]

বাংলার কৌমসমাজ চর্তুবর্ণাশ্রম থেকে ভিন্ন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সবাই এখানে শূদ্র। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী শূদ্র সৎ ও অসৎ (গুপ্তযুগেও স্বীকৃত) দুই শ্রেণীতে বিভাজিত। সৎ শূদ্র পর্যায়ে আছে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, জুবর, স্বর্ণকার, কর্মকার, বণিক, কুম্ভকার, সূত্রধর, পটুয়া প্রভৃতি। অসৎ শূদ্রেরা ছিল পতিত। এদের মধ্যে উপরি-উক্ত বর্ণ ছাড়াও ধীবর, তেলী, চর্মকার, শুঁড়ি প্রভৃতি ছিল। 'অসৎ শূদ্রের পরে স্থান অন্ত্যজ শ্রেণীর। এরা অস্পৃশ্য এবং এদের স্থান ছিল সমাজ-বিভাজনের সর্বনিম্নে।'[৭] এ থেকে অনুমান করা হয়, হাড়ি, ডোম, জোলা, বাগদি, চণ্ডাল, মল্ল, দুলে, পাটনী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিগুলো ছিল আদিবাসী কৌমের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণ-বিভেদ প্রথায় কৈবর্তদের স্থান অনেক নীচে হ'লেও এরা আর্যপূর্ব কৌম।

'ব্রাত্য' ভাষিক পরিচয়ে নিম্নবর্গীয়। বৈদিক বর্ণবিভাজনে চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত শূদ্র ছাড়াও নিষাদ ও অস্ত্রের মতো কয়েকটি অনার্য জনগোষ্ঠী ও বারোটি কারুশিল্পী গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে, যারা সৎ শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত। 'বৈদিক কালে এই সব অনার্য গোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভূত করার জন্য আরেকটি উপায় উদ্ভাবিত হয়: ব্রাত্যতত্ত্ব।'[৮] কৌটিল্য ও মনুর ব্যাখ্যায় দেখা যায়— ব্রাত্যরা আসলে দ্বিজ ছিলেন। ব্রতচ্যুত হওয়ার ফলে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অর্থাৎ ব্রাত্য। ব্রাত্যরা বর্ণসঙ্কর এবং মিশ্র জাতিগোষ্ঠী। মনুও ব্রাত্যদের মিশ্রজাতি ব'লেছেন। কিন্তু এদের জন্মের জন্য শূদ্রদের দায়ী করেননি। 'মনু ও কৌটিল্য উভয়ে ব'লেছেন, ব্রাত্যরা বর্ণসঙ্কর এবং প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে ভ্রষ্ট।'[৯]

সাধারণভাবে ব্রাত্য ব'লতে বলা যায়, আচরিত বিধিবিধান মান্যকারী জনগোষ্ঠী। আবার বাংলার হিন্দুসমাজ বিভাজনে শূদ্ররা ব্রাত্য, অন্ত্যজ। অন্ত্য অর্থ বাহ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বর্ণ প্রথার বহির্ভূত অস্পৃশ্য শ্রেণী। উপর্যুক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে ধারণা করা যায়— ব্রাত্যরা একক কোনো গোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী নয়। নিম্নবর্ণ ও নিম্ন বিত্তের অন্ত্যজ শ্রেণী। এরা অস্পৃশ্য, পতিত। শূদ্রেরা মন্ত্রহীন। ঘৃণ্য পেশায় নিযুক্ত থাকার কারণে অস্পৃশ্যও বটে।

৩

হক শকবের চতুর্থ দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলন, প্রভৃতির উত্তাপ রাজনীতিমনস্ক ও সমাজসতর্ক তারাশঙ্করের প্রতিভার বিকাশ ও শিল্পদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হ'লেও তাঁর সাহিত্যপ্রেরণা অগ্রসর হ'য়েছে রাঢ় অঞ্চলের নানামাত্রিক জীবন অবলম্বনে। রাঢ় অঞ্চলের বীরভূম জেলার, লাভপুর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে তারাশঙ্করের জন্ম। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি সমকালীন সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, রাঢ় বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি, ময়ূরাক্ষী নদী, খরা-বান, স্বকালপীড়িত সামাজিক প্রতিবেশ, উপলব্ধি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রেছেন তিনি ডোম, বাউরি, বীরবংশী, সাঁওতাল, কাহার, সাপুড়ে, বেদে প্রভৃতির ব্রাত্যজীবনধারা। অন্ত্যজ পাড়া থেকে আহরণ করা বিচিত্র জীবন ও চরিত্র তাঁর ছোটগল্পে এসেছে অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে। তাই ব্রাত্যজীবন সৃষ্টিতে তিনি গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরঙ্গতম জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বলা যায়, 'তাঁর অন্বিষ্ট ছিল সুস্থ, সবল রসমণ্ডিত এক জীবনচেতনা'[১০], যা তিনি ব্রাত্য-অশুচি জীবনাচরণের কালকূট থেকে অমৃত তুলে আনার অভীপ্সায় রূপময় ক'রে তুলেছেন। তিনি তিল তিল ক'রে ফলিয়েছেন একটি সমগ্র জীবনের ছোট-বড় অসংখ্য বিচিত্র উপকরণ; রূপায়িত ক'রেছেন অন্ত্যজ পাড়া থেকে আহরণ করা অবজ্ঞাত, মতিচ্ছন্ন, মিথ্যাচারী বিচিত্র জীবন ও চরিত্র। 'প্রবৃত্তির আকর্ষণ, নিয়তির বন্ধন, অন্ধ আসক্তি, প্রকৃতির সর্বনাশা হাতছানি, মৃত্যুর ছলনা, লোকজীবনের আদিমতা ও কুসংস্কার, অবচেতন মনের আদিম বৃত্তির লীলা ও জৈবসত্তার তাগিদ বিচিত্র প্রকরণে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে।[১১] তাঁর একাধিক ছোটগল্পে এ-জীবন সত্যের পরিচিতি মহিমাদীপ্ত ও উজ্জ্বল।

৪

'স্রোতের কুটো' (*পূর্ণিমা,* আষাঢ়–১৩৩৪) গল্পটি ব্রাত্যজীবনের আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনে পারিবারিক সংকট ও প্রত্যাশা-প্রাপ্তির কাহিনী। পোড় খাওয়া বাস্তবজীবনে প্রীতি-ভালোবাসা মান-অভিমানের অতৃপ্ত কাহিনীর পাশাপাশি মহাজননির্ভর জীবনের দৈন্য, আর্তি ও গ্লানি এই দু'য়ের চিত্রাঙ্কনে গল্পের সম্পূর্ণতা এসেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র গোপাল কোনাই নানামাত্রিক বিশ্লেষণে পরিপুষ্ট। সে সত্যবাদী এবং স্নেহকোমল। ছোটবেলা থেকেই তার সরলতা নির্বুদ্ধিতা ব'লেই বিবেচিত। নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনবৈচিত্র্য গোপাল চরিত্র নির্মাণ ও গল্পের পরিণামসৃষ্টিতে সহায়ক। গোপাল চরিত্র আবেগ তাড়িত এবং স্নেহপরায়ণ। ভাইঝি গৌরীকে সে অত্যধিক স্নেহবশে সুপাত্রে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ ক'রত। কিন্তু সে আশা যখন রাখাল ধূলিস্যাৎ ক'রে দেয়, নিতান্ত স্বার্থান্ধ, স্নেহহীন নির্দয়ের মতো, তখন গোপাল অর্বাচীনের মতোই ভাই রাখালের মাথা ফাটিয়ে বসে। কুচক্রী রাখালকে প্রাপ্য শাস্তি দিতে গিয়ে সে হ'য়ে প'ড়ে খুনে, ডাকাত এবং পরিণামে হাজত বাস ক'রে। হাজতে নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত, স্মৃতিভারাক্রান্ত গোপালের মানসিক ক্লেশ লেখক মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যায় বিবৃত ক'রেছেন। এ চরিত্রের সংকট, স্মৃতিঅনুধ্যান বাহ্যিক দৃষ্টিতে চরিত্রোচিত নয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে আবেদনবাহী। ফল্গুধারার মতো নিঃশব্দে বহমান তার স্নেহ, গৌরীর প্রতিরূপ সে খুঁজে পায় জেলারের কন্যার মধ্যে। নীচজাতিসুলভ নেশার উন্মত্ততা ও বিশুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহ এক-ই ভাবে গোপাল চরিত্রে প্রবাহিত। স্ত্রীর প্রতিও তার প্রণয় ও মুগ্ধতা ভদ্রজনোচিত। হাজতবাসের সময়-ই শুরু হয়, তার চরিত্রের দ্বিতীয় পর্যায়। সে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ক'রে এবং প্রিয় মুখগুলির কল্পনায় অন্তর্লীন অনুভূতিতে আত্মমগ্ন থাকে। লক্ষণীয়, গোপাল-কাত্যায়নীর দাম্পত্য অনুরাগ সুস্থিত শৈল্পিক সিদ্ধিতে জীবনসংযোগের সামগ্রিকতা অর্জন করেনি। সহমর্মিতা, অনুরাগ ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও দুটো জীবনের মেরুকরণ ঘটেনি। ট্রাজিক বিষাদ ও দ্বন্দ্বমুখর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর দুটি নরনারীর জীবনে অনিবার্য পরিণাম রচিত হ'ল 'স্রোতের কুটো' গল্পে।

পার্শ্বচরিত্র কাত্যায়নী আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর নয়। তার সংলাপ, আচরণ— সমাজ ও পরিবেশসঞ্জাত। চরিত্রটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির শিকার। গোপালের অনুপস্থিতিতে তার স্বভাবজাত কাঠিন্য দ্রবীভূত হ'য়েছে। রূঢ়ভাষী, মুখরা কাত্যায়নীর মানসিক পরিবর্তন লক্ষণীয় :

'জেল-ফেরত গোপালকে নিষ্ঠুর বাক্যে প্রত্যাখ্যানের একটু পরেই তার বুকটা কেমন ক'রে উঠল— আহা, এতদিন পরে মানুষ ঘরে ফিরে এল, এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে একটু জল খেতে দিলাম না।'

কাতির এ অন্তঃপীড়ন ভালোবাসার স্বভাবজাত। সামাজিক পরিচয়ে নীচু জাতি হ'লেও কাত্যায়নী চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা ও মিথ্যাকে ঘৃণা ক'রে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসার দায়ে, আর্থিক দৈন্যে অসহায় কাত্যায়নী পাওনাদারদের মিথ্যা ব'ললেও, এটাকে সে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। অপ্রিয়ভাষী কাত্যায়নী ঝংকার দিয়ে উঠেছে। 'ওরে ও নিলেজো, মুখপোড়া, তোর জন্য আর কত মিছে কথা বলব রে? তোর না হয় ইহকালও নাই, পরকালও নাই, কিন্তু আমি পরকালে গিয়ে জবাব দেব কি, বল দেখি?' গোপালের হাজতবাসের দীর্ঘ বিরহে, তার পথ চেয়ে, গায়ে খেটে অপেক্ষায় থেকেছে, অস্তিত্ব ও সতীত্ব রক্ষায় যে দৃঢ় শক্তি অর্জন ক'রেছে, সে গৌরী প্রসঙ্গে মুহূর্তে গোপালের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছড়িয়েছে। গৌরী প্রসঙ্গই যেন তার নিয়তির নির্মম দণ্ড হ'য়ে মানসিক শান্তি, স্বামীসঙ্গ ও সাংসারিক সুখ নষ্ট ক'রেছে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় এই অন্ত্যজ রমণী অন্তর্মুখী বেদনায় নীল হ'য়েছে। অভিমানিনী, স্বামী-প্রেম-পাগলিনী তাই আত্মহননের মধ্য দিয়ে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছে।

'স্রোতের কুটো' গল্পে প্রধান চরিত্র হিসাবে গোপাল-রাখাল-কাত্যায়নী ভাগ্যের হাতের কুশীলব। 'গল্পে বিশেষ চরিত্রের নির্বিশেষ ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠবে, তার আচার আচরণজাত চিত্ত-স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে।'[১৩] এ কথা তারাশঙ্করসৃষ্ট ব্রাত্য চরিত্র সম্পর্কে ব'ললে অত্যুক্তি হয় না। অন্ত্যজ চরিত্রের অবয়ব নির্মাণে, গল্প-কথকতায় পরিণামমুখী পরিবেশ সৃষ্টি বাস্তবসম্মত। ব্রাত্য জীবনের হৃদয়বোধগত সমস্যা, মানস প্রকাশ, অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার মিলিত সমাজবাস্তবতা অপূর্ব শৈল্পিক সিদ্ধিতে সার্থকতা লাভ ক'রেছে 'স্রোতের কুটো' গল্পে।

'কল্লোল' পত্রিকায় লিখলেও তারাশঙ্কর কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের জীবন সম্পর্কে সংশয়, বিশ্বাসহীনতা মেনে নেননি। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে মানবজীবন নিয়ে নানা পরীক্ষা ক'রেছেন, আর তা ক'রতে গিয়ে আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রজীবন ও মানুষকে বেছে নেননি সব সময়ে। নেমে এসেছেন অশিক্ষিত, অমার্জিত, আদিম কামনা-বাসনায় ভরা অন্ত্যজ মানুষের ভিড়ে। 'স্থলপদ্ম' গল্পটি সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনসম্পৃক্ত শিল্পসৃষ্টি। আদিবাসী বাউরি সম্প্রদায়ের শ্রমিক নারীর মাতৃত্বকামনা, গল্পে মানবিক রসে ঘনীভূত হ'য়েছে। 'স্থলপদ্ম' (*কল্লোল*, শ্রাবণ ১৩৩৫) গল্পে লেখকের মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও জীবনের প্রতি আকর্ষণ বড় হ'য়ে

দেখা দিয়েছে। গল্পটি আবর্তিত হ'য়েছে বেলেকে কেন্দ্র ক'রে। গণি রাজমিস্ত্রীর বাঁধা খাটুনির মজুর সে। সমাজে তার অপবাদের অন্ত নেই। কিন্তু নিন্দা, কুৎসার ঝড় সত্ত্বেও মানসিক স্থৈর্য বেলের জীবনে সদর্থক শক্ত ভূমি নির্মাণ ক'রেছে। অখ্যাত, অন্ত্যজ পল্লীনিভৃত মানুষের সুখ-দুঃখে সমব্যথী সে। মৃত্যু-বিভীষিকা কলেরায় আপনজন হারিয়ে সংসারে সে অসহায় নয়। পরোপকারিতার উজ্জ্বলতা ও পরিবেশ-বহির্ভূত ব্যক্তিত্ব তার অস্তিত্বের মূল কথা। যে পরিবেশে সে জীবনপ্রাপ্ত ও বর্ধিত, তার বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর এভাবে: 'গ্রামের প্রান্তে পায়রা খুপির মত ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা কালিপড়া হাঁড়ির গাদা, ছাইয়ের রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারী।' এমন অকিঞ্চিৎকর পরিবেশসঞ্জাত সম্প্রসারিত, এই নারী চরিত্রটি। নারকীয় পরিবেশে, ততোধিক নোংরা মানুষের মদ-গাঁজায় বুঁদ হ'য়ে হৈ-হুল্লোড়ে যে আদিম জীবনোল্লাস, সেখানে বেলের মতো জীবনমুখী চরিত্রের পূর্ণায়ত রূপ তারাশঙ্করের বাস্তবমনস্ক সৃষ্টি।

এ গল্পে তারাশঙ্কর ব্রাত্যজীবনের সমাজসচেতনতা স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন বেলের মাতৃত্ব কামনা প্রসঙ্গে। যতই অনাচারী, কদাচারী জীবন যাপন করুক, বেলের কিন্তু অবৈধ মাতৃত্ব কাম্য ছিল না। তাই তার প্রতি অনুরক্ত বাউরি সম্প্রদায়ের হারার প্রতি প্রচ্ছন্ন ও শুদ্ধ প্রেমের প্রশ্নে হারাকেই বিবাহ ক'রে বেলে, সন্তান কামনাকে কেন্দ্র ক'রে। 'স্থলপদ্ম' গল্পের শেষাংশে তীব্র সংকট সৃষ্টি হ'য়েছে হারা-বেলের সংসারে। যে সন্তান কামনায় বেলে ঘর বেঁধেছিল হারার সঙ্গে, সেই সন্তান আগমন সংবাদ সুখে বিভোর করে বেলেকে, অপর পক্ষে হারার মনে সৃষ্টি ক'রে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। দু'জনের গন্তব্য এক হ'লেও চাওয়ার ঐক্য ছিল না। এ গল্পে অন্ত্যজ সমাজ-প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর হারা-বেলের অন্তর্দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যায় পরিণামমুখী ক'রে তুলেছেন। সন্তানসম্ভবা বেলে আশ্রমের জন্য, সন্তানের নিরাপত্তার জন্য একাকী অস্তিত্বের সংগ্রামে রত থেকেও দৈন্যভারপীড়ন থেকে মুক্তি পায়নি। সংসারে একদিন সে আপদে-বিপদে সাহসিকতার মতো যাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এই দুর্দিনে তারা কেউ-ই বেলের প্রতি সামন্যতম সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। বরং জুটেছে কিছু করুণা আর ধিক্কার। অবশেষে অনাহারী, অবসাদগ্রস্ত জীবন-উন্মূলিত বেলে আবর্জনার সামিল নোংরা-মনের মানুষগুলোর ক্লেদাক্ত ঈর্ষা-স্বার্থপরতার আঘাতে, জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, সন্তান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে। পরিণামে, জীবনে সর্বস্বহারা উন্মাদিনী বেলে না– পাওয়া সন্তানকে শ্মশানের বুকে খুঁজে ফেরে। এখানেই গল্পটির ট্রাজিক আবহ করুণ রসের সৃষ্টি ক'রেছে। পদ্ম পাঁকেই ফোটে, সমাজের ক্লেদাক্ত পাঁকের মধ্যে তারাশঙ্কর বেলের মতো চরিত্র সৃষ্টি ক'রে স্থলপদ্ম

ফুটিয়েছেন। অন্ত্যজ, ব্রাত্য হওয়া সত্ত্বেও বেলে চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যে উচ্চ পর্যায়ের। তার মধ্যে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব, ধর্মভীরুতা, সমাজসংকট, আত্মনির্ভরশীলতা ও সুগভীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা বিরাজিত। সে পরোপকারী ও মানুষের প্রতি সহমর্মী। নারীর অবৈধ সন্তান বেঁচে থাকে না, গনি মিস্ত্রির মুখে অসতী এ-কথা শুনার পর সে শিহরিত হ'য়েছে। নষ্ট-হওয়া সত্ত্বেও সে বিবাহিত জীবনে সন্তান চেয়েছে। বুড়ী-কালিতলায় মানত তার ধর্মীয় বোধকে উন্মুক্ত ক'রেছে। এভাবে তারাশঙ্কর সমাজ প্রতিবেশের ঊর্ধ্বে বেলে চরিত্রের সংকট রূপময় ক'রেছেন।

উত্তর ভারতে, বীরভূম অঞ্চলে নীচু, অন্ত্যজ শ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে, স্ত্রীলোকদের মাঝে মাঝে ডাইনীতে রূপান্তরিত হওয়ার কুসংস্কার প্রচলিত। নির্বোধ মানুষ তাদের, নিজেদের কল্যাণার্থে পুড়িয়ে মারে অথবা জনপদ থেকে বিতাড়ন ক'রে। বাস্তবমনস্ক তারাশঙ্করের 'ডাইনীর বাঁশী' (*ভারতবর্ষ,* বৈশাখ ১৩৪০) গল্পটি এমনি এক কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ-জাত এসব রমণী, মানবীয় ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ ও স্নেহ-আত্মীয়তার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও সমাজ-নির্বাসিত ও জীবন থেকে উন্মূলিত। তারাশঙ্কর এদের অন্তঃপীড়ন ও পরিণাম অপূর্ব মনোলৌকিক শুশ্রূষায় রূপময় ক'রেছেন। গল্পাংশ পরিণামমুখী। অন্ত্যজ বেনেদের মেয়ে স্বর্ণ বাল্যবিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন। তার জীবিকা হাটে হাটে তরকারি বিক্রি করা। প্রতিবেশী সৌরভীর নাতি টুকুকে সে স্নেহ ক'রে এবং তার সঙ্গে বর-কনে সম্পর্ক পাতায়। শিশু-কিশোর ও তরুণী বধূদের বিচিত্র সব শখের জিনিস কিনে আনতে স্বর্ণের জুড়ি নেই। স্বর্ণ তাই এদের সবার প্রিয়পাত্রী। এই গল্পকথকতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সমাজ-প্রোথিত কুসংস্কার ও সমাজস্থিত মানুষের জীবনে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া। মনোরোগগ্রস্ত একটি চরিত্রের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বর্ণের মা ডাইনী ছিল, এই অপবাদে অকারণ নিগৃহীত স্বর্ণ ভেতরে ভেতরে সংকুচিত হয় এবং অবচেতন মনে এক ধরনের শঙ্কা অনুভব ক'রে। এই শঙ্কা অন্ত্যজ সমাজপরিধিতে প্রচলিত কুসংস্কারজাত। সমাজ-গহ্বরে প্রোথিত কুসংস্কার, সমাজস্থিত মানুষের বিশ্বাস ইত্যাদি মিলিয়ে যে অন্তর্জগৎ তৈরি, সেখানে বারবার বলা একটা কথার সত্য কেউ যাচাই ক'রে দেখে না। তেমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় স্বর্ণের ক্ষেত্রে। একজন ভালো মানুষও নিজের সম্পর্কে কোনো আপন, কোনো রহস্যময় ইঙ্গিত বারবার শুনলে তার মনোজগতে একটা অনিশ্চিত সন্দেহের উদয় হয়। স্বর্ণ তার সম্পর্কে ডাইনী অপবাদ শুনতে শুনতে অবচেতন মনে একটা বিশ্বাস, একটা সংশয় অনুভব ক'রে। উপযুক্ত পরিবেশ-প্রকৃতির পরিবর্তন, মনের ভিতর শেকড়ায়িত কুসংস্কারের বীজ ইত্যাদির উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে, স্বর্ণের ডাইনী হওয়ার পক্ষে। সাওগাঁয়ের হাট থেকে ফেরার পথে তপ্ত বালুর মাঠ, অনলবর্ষী

আকাশ, হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাওয়া, একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থান ইত্যাদি স্বর্ণের মনোজগতে ভয়াল পরিবর্তন আনে। মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যায় তৈরী মানসভূমিতে স্বর্ণ অসচেতনভাবেই মায়ের কথা ভাবতে থাকে, সংশয় বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়, মায়ের স্বভাব তার মধ্যে তো থাকতেই পারে। তারাশঙ্কর পরিবেশ-কল্পনায় মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যা ক'রেছেন। আকাশের কালো মেঘ "ধূমপুঞ্জের মত সেগুলো পরিধিতে ক্রমশঃ ফুলিয়া ফুলিয়া বাড়িতেছে। হয়তো কালবৈশাখীর ঝড় উঠিবে। স্বর্ণ গতি দ্রুততর করিল। আচ্ছা, আজই যদি এখনই সে ডাইনী হইয়া যায়।" অবচেতনে এই কুসংস্কার এমনভাবে তার মনে গেঁথে গিয়েছিল যে, পরবর্তী স্বাভাবিক ঘটনাগুলোও তার কাছে অস্বাভাবিক হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

ঝড়-জলে বিপর্যস্ত স্বর্ণ, মানসিক যন্ত্রণায় অচৈতন্যের মতো অবস্থায় যখন জানল, সেই রাতেই তার স্নেহধন্যা মুখ্যজ্জেদের তরুণী বৌটা পেটের সন্তানসহ মারা গেছে এবং এ ব্যাপারে তার কুটিল দৃষ্টিকে দোষারোপ করা হ'চ্ছে, তখন সে সত্যিই আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। ডাইনী হওয়ার সম্ভাবনা তার মানবিক অনুভূতিতে ভীতির সঞ্চার ক'রে। সে যে সত্যিই ডাইনী নয়, তার দৃষ্টির নির্মম অপঘাতে বৌটা মারা যেতে পারে না, এ সত্য-মিথ্যার মীমাংসা কেউ করে না। প'ড়ে গিয়ে গর্ভবতী নারীর এ অবস্থা ঘটা স্বাভাবিক, ঘটনার এ বাস্তব দিকটাও কেউ ভাবে না। মনের কল্পনা, ঘটনার আকস্মিকতায় দুর্বল, অনাহারক্লিষ্ট, মনুষ্যবর্জিত, নৈঃসঙ্গ্য বিহ্বল স্বর্ণকে মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ ক'রে। তার কাছে চিলের চীৎকার অস্বাভাবিক মনে হয়, স্বাভাবিক উগেমোদ্যত তালগাছটার ফলভার সে যেন, মনশ্চক্ষে দেখতে পায়। এমন মানসিক উন্মত্ততার দুঃসহ মুহূর্তে স্নেহপোষ্য টুকুকে অবলম্বন হিসাবে পেয়ে, তাকে আদর করার সময় তার বদ্ধমূল ধারণা হয় সত্যিই সে ডাইনী, তা না হ'লে পরের ছেলেকে সে ভালোবাসে কেন? স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিসমূহ সম্পর্কেও তার সন্দেহ দেখা দেয়। হৃদয়গত ও বাহ্যিক, সামূহিক পীড়নে সে সমাজে সত্যি সত্যিই ডাইনী হিসাবে পরিগণিত হয়। এ গল্পের স্বর্ণ সুস্থ সমাজ-পরিবেশে, স্বাভাবিক মানুষের মতো সুস্থিত ছিল। বিধবা বলে, সন্তান প্রাপ্তি ছিল অবান্তর কিন্তু শিশুরাজ্যে সে ছিল স্নেহশীলা স্বর্ণ মাসি, টুকুর ক'নে। সবাইকে বিশুদ্ধ ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে সামাজিক সম্পর্ক পাতিয়ে সে বহুজনের সমন্বয়ে, নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। সমাজের কুসংস্কার তাকে মানসিক পীড়ন-জর্জরিত ক'রেছে। সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষা ও কুসংস্কার স্বর্ণের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ক'রেছে। একদিকে তরুণীবধূর মৃত্যুতে শোক, টুকুকে স্নেহপীড়নের গ্লানি, তীব্র অনুশোচনাজনিত হৃদয়-দহন প্রভৃতি মানবিক বিষয়; অপরদিকে, মানসিক অস্থিরতায় দ্রুতপদচারণ ও আর্তনাদ ইত্যাদির

সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পায় 'ডাইনীদের ঘরময় বাট ব'য়ে বেড়ানো স্বভাবের' সঙ্গে। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে স্বর্ণ রক্তাক্ত, পরিশ্রান্ত। বঞ্চিত, অবহেলিত হতভাগ্য ডাইনীকল্পিত নারীদের হৃদয়বেদনা ও জীবন প্রবৃত্তি তারাশঙ্কর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ক'রে প্রকাশের জন্য অন্ত্যজ, ব্রাত্যজীবনে সংস্কার ও সমাজ-বিশ্বাসকে মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যায় 'ডাইনী' গল্পে রূপায়িত ক'রেছেন।

রাঢ়ের কংকরাকীর্ণ জলহীন প্রান্তরে মধ্যাহ্ন সূর্যের যে অসহ্য দাহ, যে বুকফাটা পিপাসা, তারাশঙ্করের গল্পে তার-ই এক শুষ্ক লেলিহান রসনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। লোভ-লালসা, স্নেহ-কামনা সব কিছুই এই খররৌদ্রের রুদ্র রসে অভিষিক্ত। 'বেদের টোল, আখড়া ও আখড়াইয়ের দীঘি, বাদশাহী সড়কের পাশে শিকার-সন্ধানে প্রতীক্ষারত ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো ঠ্যাঙ্গাড়েদের কথা, ভাষায় ক্লাসিক সংহতি ও গভীর অন্তরদৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে।'[১৪] পাশাপাশি বাউরি, বাগদি, আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষ তাঁর ছোটগল্পে বৃহৎ প্রতিবেশে স্থান পেয়েছে। এদের প্রতিনিধিত্বকারী গল্প 'আখড়াইয়ের দীঘি' (*প্রবাসী,* কার্তিক ১৩৪০)। গল্পকথনের মাধ্যমে উন্মোচিত হ'য়েছে ভয়ংকর খুনী ও ডাকাত কালীচরণ ওরফে কালী বাগদির চরিত্র ও কার্যকলাপ। বাগদিরা বংশগতভাবে ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত। এরা দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। শিকারের আশায়, কালী বাগদিরা নির্জন অন্ধকারে ব'সে থাকত, মাথায় জ্ব'লত মদের নেশার আগুন। এভাবে হতভাগ্য পথিকদের জীবন ও সম্পদ নিঃশেষ হ'ত তাদের হাতে। অবশেষে, এক ঝড়-জলের রাতে মদের নেশায় মত্ত হ'য়ে, কালীচরণ ভুল ক'রে অপরিচিত পথিক ভেবে একমাত্র পুত্র তারাচরণকে খুন ক'রে। পুত্রবধূ চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল। বিচারে কালীচরণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'ল। দণ্ডভোগের পরে, ছাড়া পেয়ে কালী বাগ্‌দি ছুটে এসেছে আখড়াইয়ের দীঘিতে, যেখানে তারা নিহত হতভাগ্য পথিকের লাশ গুম ক'রত। ঐ দীঘিতে নিজের হাতে তার ছেলের লাশও পুঁতে রেখেছিল।

এ গল্পে নিয়তি ক্ষমাহীন বিচারকের ভূমিকায় প্রকৃতিদত্ত প্রতিশোধ নিয়েছে কালী বাগ্‌দির উপর। 'তারাশঙ্করের গল্পেও নিয়তির অমোঘ লীলা বারবার প্রাধান্য পেয়েছে।' এর পরিচয় মেলে 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী' প্রভৃতি গল্পে। এসব গল্পেও ঘটনার সার্বিক বর্ণনায় জীবনের যে হিংস্র রূপ ফুটে উঠেছে, তার পরিণাম চিহ্নিতকরণে কর্মফলের নিষ্ঠুর লীলারহস্যই উন্মোচিত হ'য়েছে। কৈশোর উত্তীর্ণ সবল যুবক পিতার হাতে খুন হ'য়ে, প্রকারান্তরে প্রকৃতিগত প্রতিশোধের শিকার হ'য়েছে এবং পিতার জীবনে ট্রাজেডিকে ত্বরান্বিত ক'রেছে। প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হত্যার পর অনুশোচনায় দগ্ধ পিতা পশুর মতো জ্বলন্ত চোখে অন্ধকারে আখড়াইয়ের দীঘিতে

এসে পাগলের মতো ছেলের নাম ধ'রে ডাকত। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কালীচরণ চরিত্রের মর্মপীড়া, চিত্তের জ্বালা, অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাকর দাহ পাঠককে স্পর্শ ক'রে। হিংস্র কালী বাগ্‌দি তার কর্ম ও জীবনাচরণে মানুষের ঘৃণার্হ হ'লেও গল্পশেষে ঐ অভিশপ্ত, ঘৃণ্য মানুষটির প্রতি লেখকের কারুণ্য প্রাধান্য পেয়েছে 'দেহ আর মর্গে পাঠাবেন না। ঐ আখড়াইয়ের গর্ভেই ওকে থাকতে দিন।'

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে সাপ একটা বিশেষ স্থান দখল ক'রে আছে। সর্পপ্রীতি ও সর্পবিশ্বাস আদিবাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য। 'এ সব মানুষের আদিম জীবন নিয়ে তারাশঙ্কর অনেক গল্প লিখেছেন। তাদের মধ্যে দেখেছেন জীবশক্তির লীলা ও আদিমতা। 'নারী ও নাগিনী' (দেশ, শারদীয়া ১৩৪১) গল্পে আদিমতার রূপ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।[১৫] কাহিনীর নায়িকা উদয়নাগ সাপিনী, প্রতি-নায়িকা জোবেদা। নায়ক নেশাখোর, বিকলাঙ্গ, খোঁড়া শেখ— পেশায় ওঝা, জাতে মুসলমান, আচরণে হিন্দু এবং পরিচয় সাপুড়ে। গল্পটিতে খোঁড়া ও সাপিনীর নির্দোষ রসলীলা মানবীয় আসক্তিতে সম্প্রসারিত হ'য়েছে। একটি সাপিনীর প্রতি খোঁড়ার আসক্তি, এবং পরিশেষে তার দংশনে ঈর্ষান্বিত জোবেদার মৃত্যু গল্পের মূল বিষয়। গল্প কাঠামো ও বিষয়বস্তুর বাইরে একটা সত্য এ গল্পে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তা জৈবধর্ম। অন্তরধর্মে হিংস্র প্রাণী সাপও পোষ মানে এবং ভালোবাসে, এই জৈবধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে গল্পে।

নিজে কদর্য চেহারার হ'লেও সৌন্দর্যের প্রতি খোঁড়ার অনুরাগ অপরিমিত। সে ইটের পাঁজার অদূরে উদয়নাগ সাপিনীর ক্রীড়ারত অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে ঝাঁপিবন্দী ক'রে ঘরে রেখেছে। সাপিনী একটু বড় হ'লে তার নাকে অলংকার পরিয়ে, মাথায় সিঁদুর দিয়েছে, এখানে তার সৌন্দর্য পিপাসু মনের বহিঃপ্রকাশ ঘ'টেছে। সাপকে বিবি বানানোর মধ্যে কৌতুক প্রবণতা থাকলেও চুমু দিয়ে আদর করার মধ্যে বিষধর সাপকে পোষ মানানোর এক ধরনের নেশা কাজ ক'রেছে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের রূপায়ণ এখানে বিজ্ঞানবুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রেছে। খোঁড়া চরিত্র নির্মাণে অন্ত্যজ সমাজবাস্তবতা সত্যনিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। একজন ওঝার পক্ষে সাপ নিয়ে খেলা করা, পোষ মানানো স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু এই পোষ মানানোর ভেতর কোনো জৈবিক স্বার্থপরতা বা আকর্ষণ কাজ করেনি। এমনকি নাগিনীকে বিবি বানানোর ফলে তার পারিবারিক কোনো দ্বন্দ্ব বা জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। স্ত্রী জোবেদাকে সে ভালোবাসে প্রাণাধিক। তার স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের মধ্যে এক ধরনের শিশুসুলভ সারল্য আছে। পারস্পরিক ভালোবাসার নির্ভরতা সুস্থ দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিতবাহী। স্ত্রী জোবেদার মৃত্যুতে খোঁড়া মর্মান্তিক মানসিক

আঘাত পায়। কিন্তু খোঁড়া, জোবেদার মৃত্যুর জন্য দায়ী বিবিকে বধ ক'রতে পারে না। প্রিয় বিবিকে সে ছেড়ে দেয় এবং সংসার-বিরাগী হ'য়ে ফকিরি নেয়। এখানে তার ভালোবাসার দ্বৈতসত্তার প্রকাশ ঘ'টেছে। ভালোবাসার জনকে শাস্তি দেওয়া যায় না... অবচেতন মনে খোঁড়ার মধ্যে এ সত্যই ক্রিয়াশীল। সংসার-বিচ্যুত খোঁড়ার পরিণতি জোবেদার মৃত্যুর চেয়েও বেদনাতুর আবহ সৃষ্টি ক'রে। একদিকে স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক ও সুগভীর ভালোবাসা, অন্যদিকে শখের পোষ্যের প্রতি মমত্ববোধ, তার হৃদয়কে বেদনাবিদ্ধ ক'রেছে। অশান্ত হৃদয় বেদনাকে এভাবে সে প্রশমিত ক'রেছে: 'তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাব-ই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।' এখানে সাপের প্রতি মানবীয় অনুভূতির নিঃসরণে তার ভালোবাসার বাস্তবতা পরিলক্ষ্য।

জোবেদা চরিত্রের জটিলতা কম। কদর্যতায় স্বামী খোঁড়া শেখের সমগোত্রীয় সে। স্বামীকে সে ভালোবাসে আত্যন্তিক বিশ্বস্ততায়। তার সুখ-দুঃখের সমব্যথী। খোঁড়া নাগিনীর মাথায় সিঁদুর এঁকে দিয়ে— 'ও তোর সতীন হ'ল' ব'ললে এটাকে জোবেদা কৌতুক হিসাবে নিলেও, তার মনে এক ধরনের সপত্নীসুলভ ঈর্ষা বর্ধিত হয়। তবে খোঁড়ার বিবি-প্রীতিতে তার প্রতি জোবেদার ভালোবাসা এতটুকু কমে না। সে রাগ করে না, বিরক্ত হয়। নিষেধ ক'রে এবং বিষধর সাপের ব্যাপারে সাবধান বাণী শোনায়। সাপিনীকে আদর করার ঘটনা জোবেদার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে বলে, 'এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো।' ঐ পর্যন্তই। ঈর্ষার জ্বলুনি ক্ষতিকর উপাখ্যানে পর্যবসিত হয় না। নাগিনীর চরিত্রে একটা অদ্ভুত বিবর্তন আছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে সত্যি-ই ভালোবাসা থাকতে পারে, তার প্রমাণ বিবি। বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে খোঁড়া তাকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসে। কিন্তু সে যেন খোঁড়াকে ছেড়ে থাকতে পারে না। পরদিন-ই জোবেদা খোঁড়ার একান্ত মুহূর্তে নালার মধ্যে তার উপস্থিতি ঘটে। জোবেদার ছুঁড়ে-দেওয়া ঘট তার গায়ে লাগলে, সে সক্রোধে মাটিতে ছোবল মারে। মাটিতে সক্রোধ ছোবল, নাগিনীর প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ। পরিণামে, 'জোবেদাকে দংশন ক'রে কোলানে হাঁড়িতে বেড় দেওয়ার মধ্যে প্রকারান্তরে জোবেদাকে সরিয়ে, খোঁড়ার কাছে আশ্রয় লাভ-ই তার কামনা। এ সবই মূক সরীসৃপ প্রাণীর মানুষের সংসারে পোষ্য হ'য়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রবণতা।[১৬] প্রেম, ভালোবাসা, নির্ভরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতায় বিবি মানবীয় স্তরে উন্নীত।

নারী চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান নাগিনীর ক্রূরতা, ঈর্ষা, জিঘাংসাবৃত্তি মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যায়, অনাসক্ত দৃষ্টিতে প্রতীকায়িত ক'রেছেন তারাশঙ্কর জোবেদা ও নাগিনী চরিত্রে। 'এ দুয়ের সাধর্ম্যের ভিত্তিভূমি ঈর্ষাবৃত্তি।'[১৭] ইতর প্রাণী ও ব্রাত্য জীবনের আদিম বৃত্তি ও জৈবিক বাসনাকে অপূর্ব শৈল্পিক সুষমা দান ক'রেছেন তারাশঙ্কর 'নারী

ও নাগিনী' গল্পে। গল্পটি তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের আর একটি নির্ভীক নিদর্শন। শুধু অন্তর্বাস্তবতা নয়, বহির্বাস্তবতায় অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন-সংগ্রাম, আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে তাদের অবস্থান, জীবনাচরণ— অন্তরঙ্গ অনুভবে চিত্রায়িত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসফল ছোটগল্প 'তারিণী মাঝি' (*আনন্দবাজার,* শারদীয় ১৩৪২)। চরিত্র-নির্ভর এ গল্পটিতে প্রবৃত্তি ও নিয়তির অমোঘ লীলা প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পাংশে তারিণী ও স্ত্রী সুখীর প্রেমময় সচ্ছল জীবন ও ময়ূরাক্ষীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের নায়ক দীর্ঘদেহী, নিঃসন্তান তারিণী মাঝি, ময়ূরাক্ষী নদীর গুণটিয়া ঘাটে খেয়া পারাপার ক'রে। ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে তাই তারিণীর জীবন, জীবিকা ও নিয়তি জড়িত। দুর্ধর্ষ সাহসী তারিণী বানের সময় নদীর বুকে ভেসে আসা জিনিসপত্র সংগ্রহ ক'রে, নৌকা-ডুবি হ'লে সাঁতরে মানুষকে উদ্ধার ক'রে। এ কাজে উপহারও কম পায় না। সেসব দিয়ে তার শ্যামাঙ্গী, সুশ্রী স্ত্রী সুখীকে সাজায়। নিঃসন্তান হ'লেও, সুখী দাম্পত্যজীবনের অধিকারী সে। তারাশঙ্কর এ গল্পে নদীকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রেখেছেন। সংলগ্ন মানুষের জীবন ধারণে, আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ক'রেছে ময়ূরাক্ষী। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীতে আসে হড়পা বান। এমনি এক বানে ময়ূরাক্ষীর করাল ঘূর্ণিতে স্ত্রী-বিচ্ছিন্ন হ'য় তারিণী মাঝি ঘূর্ণির মাঝে প'ড়ে। অবধারিত জীবনসংশয়ের সময় তাকে জড়িয়ে ধ'রে বাঁচতে-চাওয়া স্ত্রী সুখীকে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয় তারিণী। উপরে ভেসে উঠে তারিণী আলো আর মাটির আশ্রয়ে বুক ভ'রে শ্বাস নেয়। পরিমিত এবং প্রাসঙ্গিক কথনে গল্প এখানেই শেষ। এ গল্পে অন্ধ জৈবসত্তা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং জীবধর্মের জয় ঘোষিত হ'য়েছে। চরম বিপর্যস্ত মুহূর্তে অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখী হ'য়ে, মানুষের কাছে নিজের জীবন ছাড়া আর কিছুই প্রিয়তর নয়, এই-অন্ধ জৈবসত্তার জয়, এ গল্পে শিল্পরূপ লাভ ক'রেছে।[১৮]

তারিণী মাঝির চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন মিলিয়ে সম্পূর্ণ সামাজিক ও পারিবারিক বলয়ের অধীন। মানুষের অন্তর্জীবনে সুপ্ত থাকা জৈব-প্রবৃত্তি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা, যা তার একান্ত নিজস্ব। তারিণী চরিত্রে তারাশঙ্কর অবচেতনে সে প্রবৃত্তির পরিমিত এবং সংযমী প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে তারিণী প্রবল স্রোতে ঘোষেদের বৌকে প্রাণে-বাঁচতে ছুটে যায় হড়পা বানের সময়, অপরিচিত মায়ের শিশুকে অনাহূতভাবে খুঁজে দেয়, সেই তারিণী নিয়তি-নির্দেশিত দুষ্টপাকে নিজের প্রেমময়ী স্ত্রী, বিশ্বস্ত ও স্বামী-নির্ভর সুখীকে জলমগ্ন অবস্থায় হত্যা ক'রে নিজে পৃথিবীর আলো-হাওয়া বুক ভ'রে নিতে প্রয়াসী হয়। তারাশঙ্কর নিম্নবর্গীয় সমাজ-স্তর থেকে তারিণী চরিত্রটি তুলে এনে, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দান

ক'রতে চেয়েছেন যে, মানুষের জীবনতৃষ্ণা, বাঁচার উদগ্র কামনা অন্যসব জাগতিক মানবিক সম্পর্ককে তুচ্ছ, ক'রে দেয়।[১৯] সুখী চরিত্র সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতায় উজ্জ্বল। শ্রেণী হিসাবে অন্ত্যজ, কিন্তু চারিত্র্য সৌন্দর্যে, পাতিব্রত্যে ও বিশ্বস্ততায় সে বাঙালী পুরনারীর আদর্শ স্থানীয়। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, এমনকি হড়পা বানের সময়ও সে স্বামী-নির্ভর, ঐকান্তিক প্রেমে স্বামীর সহচরী। বন্যায় জল ঘরে ঢুকলেও, সে একাকী ঘরে স্বামীর অপেক্ষায় থেকেছে। কেবল স্বামী হিসাবেই নয়, মানবিক সম্পর্কেও সুখীকে বাঁচানোর কথা তারিণীর। কিন্তু তারিণী তা পারেনি। বরং জীবন-প্রত্যাশী সুখী অসহায়ভাবে হত্যার শিকার হ'য়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ, অবচেতন মনের জৈবশক্তির তাগিদ অনুসরণ ক'রে। এই মনস্তত্ত্ব তারাশঙ্কর স্বাভাবিক ও নিষ্ঠুর বাস্তবতায় রূপ দান ক'রেছেন। বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিম আর্তি। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি অন্তর্গূঢ় জীবনসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সচেতন তারিণীর স্বার্থপরতা নেই সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করার মধ্যে, আছে প্রায় অচেতন তারিণীর আদিম জৈব প্রবৃত্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ।[২০]

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সূত্রে জমিদারী জীবনব্যবস্থায় ভূস্বামীদের শাসন-শোষণের সঙ্গে তারাশঙ্কর আজন্ম পরিচিত ছিলেন। সে অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদী মানসিকতার মিথস্ক্রিয়ায় তিনি নিম্নবর্গীয় মানুষ সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন। 'সসমুদ্র মন্থন' (*আনন্দবাজার*, শারদীয়া ১৩৪৩) গল্পে একদিকে দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি ও সাধারণ জনমানুষের বাঁচার আর্তি, অন্যদিকে ক্ষুদ্র জমিদারদের আভিজাত্যের অধিকারের প্রাণমূলে পৌঁছানোর ঐকান্তিক অভীপ্সা প্রতীকায়িত। এ দুয়ের সংকটে আবর্ত সৃষ্টি ক'রেছে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য দুটি নরনারী। ছোটগল্পের মিতপরিসরে মন্বন্তরের তীব্র যন্ত্রণা, মানবাত্মার অসহায় কান্না, দিগভ্রান্ত, অনাদৃত জীবনের দৈন্যভার অন্তরার্থে পরিশীলিত হ'য়ে উঠেছে।

এ গল্পের পটভূমি দুর্ভিক্ষ। ক্রমাগত খরায় অজন্মাহেতু দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবে জনসাধারণ বিপর্যস্ত। অস্তিত্বের প্রয়োজনে, জমিদার-প্রজা উভয়-ই দুর্মর সংগ্রামে রত। 'সমুদ্র মন্থন' গল্পে আর্থ-সামাজিক দৈন্যদশা, সংগ্রামী চেতনা প্রবাহিত। পরিবেশ অঙ্কিত হ'য়েছে তারাশঙ্করের আবাল্য পরিচিত বীরভূমের খরাপীড়িত শুষ্ক, দগ্ধ মাটির ক্যানভাসে। ঐ সবকিছুর ঊর্ধ্বে সাহসিক স্বাভাবিকতায় প্রাধান্য পেয়েছে এক অস্পৃশ্য ভিখারী দম্পতির পারস্পরিক অনুরক্তি। গল্পের প্রয়োগ-পরিপ্রেক্ষণে দুর্ভিক্ষ দাম্পত্য সংকট সৃষ্টি ক'রেছে জমিদার-দম্পতি উমানাথ ও রমার মধ্যে। এ সংকট-মোচন ঘ'টেছে নিম্নশ্রেণীর দাম্পত্যের মর্মস্পর্শী রূপ-দর্শনে।

এ গল্পে ভিখারিনী মেয়ের নোংরা, অকিঞ্চিৎকর জীবনে তারাশঙ্কর যে সংরাগ ও মাধুর্যের সন্ধান দিয়েছেন, তা পরিবেশ ও সমাজ-প্রতিবেশে সত্যিই বিস্ময়কর। উন্মূলিত, পথবাসী, অনাহারী এক ভিখারিনীকে তারাশঙ্কর আভিজাত্যের সমান্তরালে প্রতিস্থাপনের এক দুঃসাহস দেখিয়েছেন এ গল্পে। তাঁর বর্ণনায় দেখী যায় 'আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে কিন্তু সর্ব অবস্থার মধ্যে কোথাও একবিন্দু তরুণ লাবণ্যের লেশ নাই, চর্মাবৃত কঙ্কাল, করকরে জিভ দিয়া কোন শ্বাপদ যেন মেয়েটির সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া লইয়াছে।' দুর্ভিক্ষের মূর্তিমান পরিচিতি। তাতে আবার মেয়েটি খোনাও। আনুনাসিক স্বরে ততোধিক দুর্বল মিনতিতে সে জমিদার বাড়িতে সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছে। এ গল্পপাঠে, আর্থ-সামাজিক জীবনসত্যের এক মর্মান্তিক দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্বামীকে সে দুর্ভিক্ষের প্রতিকূলতা, মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে অতি সন্তর্পণে বাঁচাতে চায়। নিজের অস্তিত্ব উপেক্ষা ক'রে, অনাহারে সে মনুষ্যেতর প্রাণীর পর্যায়ে উপস্থিত হ'য়েছে। জমিদার বাড়ির পায়খানা সাফ ক'রে, সবার কাছ থেকে মুড়ি-আচার ভিক্ষা ক'রে যে প্রাপ্তি, তা সব-ই স্বামীকে খাওয়ায়। আপাত দৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হ'লেও, ভিখারিণীর তুচ্ছ ক্ষমতাহীন ও নগণ্য জীবনে একটাই চাওয়া, তার স্বামীর জীবন-লাভ। তাকে মাংসের ঝোল অর্থাৎ প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ালে সে সত্যিই বাঁচবে, এই প্রত্যাশায় মেয়েটি চুরি পর্যন্ত ক'রে। চুরি সম্পর্কে তার বক্তব্যও অদ্ভুত, বিস্ময়কর : 'ডাক্তার উয়োকে মাংসের ঝোঁল দিতে ব'লেছে মাশায়। ব'লেছে মাংসের ঝোঁল একটুকুন করে না দিলে ও বাঁচবে না।'

গল্পাংশ বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষের করুণ পটভূমিতে আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে নিম্নস্থিত, অসংস্কৃত, জীবনেরও একটা দাবী আছে, সে দাবী বাঁচার এবং ভালোবাসার। এ গল্প বেদনাঘন আন্তরস্পদসমৃদ্ধ। সমাজ ও অর্থনৈতিক বৈপরীত্যে উমানাথ-রমা ও ভিখারিণী দম্পতির সম্পর্কের অন্তঃসত্য বেদনাদায়ক অনুষঙ্গসহ পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ ক'রে। 'জীবন-সমুদ্র-মন্থন ক'রে উঠেছে সৃষ্টির শেষরহস্য দাম্পত্য-প্রেম'।[২১] সম্পূর্ণ আত্মচেতনা বিস্মৃত হ'য়ে প্রিয়জনকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষার প্রোজ্জ্বল প্রয়াস নিঃস্ব দরিদ্র মেয়েটির চরিত্রে সাযুজ্যপূর্ণ। সমাজের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য শ্রেণীর কদাকার জীবনেও আবেগী প্রাণময়তা বিরাজমান। আর্থিক দৈন্যে যারা হীন, সামাজিক লোকাচারে যারা ঘৃণিত, সেইসব ব্রাত্যের জীবনের সংরক্ত শিল্পী তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে অন্ত্যজ বাগদি, ডোম, বাউরি শ্রেণীর বেশ কিছু টাইপ চরিত্র সৃষ্টি ক'রেছেন। তারা কোনো-না-কোনোভাবে নিম্নবিত্ত জীবনপরিবেশে তাৎপর্যবাহী। নির্মাণ কৌশলে এইসব ব্রাত্যজীবনে বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই শ্রেণীপরিচয়ে সমৃদ্ধ 'চোরের মা' (*বৈজয়ন্তী*, কার্তিক

১৩৪৬) গল্প। এ গল্পে বিশেষ চরিত্র ফিঙে চোরের মা। পার্শ্বচরিত্র শশী ডোম পটভূমিকে ক'রেছে গতিময় সে ঘটনাপ্রবাহ পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য ক'রেছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে এ চরিত্রটির সামূহিক উপস্থিতি শশী ডোম ও শশী চোর নামে। আশঙ্কাগ্রস্ত চোরের মাকে সে আশ্বস্ত ক'রে এভাবে, 'বউ, তুই ভাবিস না, ফিঙে আমাদের ভারি টাটোয়ার হইছে। কেউ ওকে ধ'রতে ল'রবে।'

এ গল্পে কেন্দ্রাতিগ ভূমিকা রেখেছে নতুন চোরের মা। ডোমসমাজ পরিবেশে, চোরের মায়ের অন্তর্জগতের উন্মোচন-ই গল্পের মূল লক্ষ্য। অশিক্ষিত ও অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত চোরের মায়ের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে ডোম-সমাজসম্ভব বৈপরীত্য লক্ষণীয়। ডোমদের পেশা চুরির প্রতি সরব প্রতিবাদ ও সপ্রতিভ ঘৃণা না থাকলেও, নিজের ছেলেকে চুরি ক'রতে দিতে সে নারাজ। মৃত্যুসুলভ আশঙ্কায় একমাত্র ছেলেকে সে চুরি ক'রতে নিষেধ ক'রে। চৌর্যবৃত্তিতে ধরা প'ড়ে জেলে যাওয়ার ঝুঁকিটাই তার আশংকার কারণ। মায়ের মনের এই আশংকাই তার জীবনে বড় ট্রাজেডি হ'য়ে উঠল শেষ পর্যন্ত। প্রথমদিন-ই চুরি ক'রতে গিয়ে অর্বাচীন ও অভিযান-উৎসাহী ফিঙে ধরা প'ড়ে গণপিটুনিতে মারা যায়। এই মৃত্যু চোরের মায়ের মনোরাজ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটায়। সর্বদা কান্নামুখী চোরের মায়ের কান্না আশ্চর্যতরভাবে থেমে গেল। বক্ষবিদীর্ণকারী মাতৃসুলভ হাহাকারে, শ্রাবণের সহস্রধারায় সে পুত্রশোকের অগ্নি নির্বাপন ক'রতে পারলো না। তারাশঙ্কর অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নীরব, শোকাভিভূত মায়ের অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন এভাবে— "তাহার আর একটা বাতিক হইয়াছে, কাহারও ছেলে মরিলে ফিঙের মা সেখানে ছুটিয়া যাইবেই। সেখানে সে উবু হইয়া একধারে বসিয়া সমস্ত দেখে। মায়ের কান্না দেখে, বুক চাপড়ানো দেখে আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।"

কিন্তু কোথাও সে তার সমকক্ষ সমব্যথী খুঁজে পায় না। প্রচণ্ড শোকের মৌন-বিধুর গভীরতা তার চোখে পড়ে না। অবশেষে চৌধুরী বাড়ির ছেলের মৃত্যুতে সে এক নতুনতর শোকের দৃশ্য দেখলো— "চৌধুরীর স্ত্রী ছেলের বুকের উপর পড়িয়া আছে, অসাড়, নিস্পন্দ আর একটি মৃত দেহের মতো।" শোকের এমন নীরব ব্যথাতুর, মুহ্যমান রূপ সে আর দেখেনি। এই দৃশ্যে তার চেতনার বন্ধ দুয়ার যেন বিদ্যুৎস্পর্শে খুলে গেল। নিজের শোকের একাগ্রতা খুঁজে পেয়ে, বহু দিনের পু ীভূত শোক অশ্রুক্ষরণে মুক্তি পেল। আরো একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ মনে করা চলে, এই চৌধুরী বাড়িতে চুরি ক'রতে গিয়েই মার খেয়ে তার বৈধব্য জীবনের একমাত্র স্নেহের ধন ফিঙের মৃতুতে শোকাতুরা মায়ের আর্তিতে সে যেন শোকমোচনের একটা উপায় খুঁজে পেল। অবদমিত শোক, চোরের মা হওয়ার গ্লানি, পুত্রহারানোর

ব্যথা অশ্রুবন্যায় ভেসে গিয়ে, সন্তানহারা সব মায়ের সঙ্গে, সে যেন এক পংক্তিতে স্থান লাভ ক'রল। চোরের মা-ও যে সত্যিকার মা, অন্যের পুত্রশোকের আগুন এক-ই ভাবে সে অনুভব ক'রতে পারে। এই সত্য 'চোরের মা' গল্পে উজ্জ্বল। অন্ত্যজ এই চরিত্রাঙ্কনে বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা অন্তর্বাস্তবতা অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

নিম্নবর্ণ ও ব্রাত্যজীবন পরিচর্যায় রাঢ় দেশের বেদে সম্প্রদায়কে তারাশঙ্কর গল্প উপন্যাসে অমরত্ব দিয়েছেন। বেদেরা সাপ, বাঁদর, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে খেলা দেখায়। মেলায় তাঁবু খাটিয়ে বাঘ-সিংহের খেলাও দেখায়। এমনি এক বেদে দম্পতি শম্ভু ও রাধিকা বেদেনীকে নিয়ে 'বেদেনী' গল্পের গাঁথুনি।

'বেদেনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধিকা। গল্পের প্লট জটিল হ'য়েছে, বেদেনীর জটিল মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রে। একদিকে সে চঞ্চল, উজ্জ্বল, বাধাহীন, সরল, অন্যদিকে সাপ নিয়ে খেলা করা বেদেনী-স্বভাবে সাপের মতই ক্রূর, হিংস্র ও প্রতিশোধপরায়ণ। তার নিজস্ব স্বভাবে আছে বেদেদের যাযাবরসুলভ জৈবিক প্রবৃত্তি। যুবতী রাধিকা বন্য যৌবনমদে মত্ত। তার যৌবনবৃত্তের তিনটি পর্যায়ে তিনটি পুরুষের সরব উপস্থিতি। বেদে সমাজ-বেষ্টনীতে ব্রাত্যজীবনের অশুচিতা, জীবনোল্লাস বাস্তবনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। রাধা চরিত্রে তারাশঙ্কর সেই প্রাণশক্তির জয় ঘোষণা ক'রেছেন। চৌদ্দ বছরে বিবাহিতা রাধার স্বামী শিবপদ ছিল স্বভাবে শান্ত, হিসাবী ও সংসারী। বেদে যুবতীকে সে সংসারবৃত্তে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। স্বামী, সংসার ও সমাজ উপেক্ষা ক'রে বাঁধভাঙা প্রবৃত্তির জোয়ারে সে 'উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধত দৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ দেহ' সমন্বিত শম্ভুর সঙ্গে ভেসে যায়। তৃতীয় মাত্রা যোগ হ'য়েছে শম্ভুর প্রতি চরম ঘৃণায় ও কিষ্টোর প্রতি দেহজ আকর্ষণে। বেদেজীবনের আদিম জৈবিক আকর্ষণের ঘ্রাণ, স্বভাবে নিয়ে কোথাও সুস্থিত হয়নি বেদেনী। 'আদিম স্বভাব বেদেনীর জীবনে ও রক্তে প্রোথিত বলেই সে অস্থির, ভ্রুক্ষেপহীন।'[২২] এ গল্পে পার্শ্বচরিত্র শম্ভু কিছুটা নিষ্প্রভ। তবু অন্ত্যজ বেদে চরিত্র সৃষ্টিতে বাস্তবানুরাগিতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। এ চরিত্রে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা ও প্রতিশোধপরায়ণতা বিদ্যমান। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে ও জীবনাচরণে শম্ভু বেদের চারিত্রিক কুটিলতা বাস্তবসম্মত। কিষ্টোর সফলতায়, তার প্রতি শম্ভুর ঈর্ষা জাগে। তাই নিজের অক্ষমতায় হিংস্র শম্ভু কিষ্টোর চোলাই মদের সন্ধান জানিয়ে পুলিশে খবর দেয়। অকৃতজ্ঞ শম্ভু ভুলে যায় রাধিকা বেদেনীর উপকারিতা।

রাধিকা চরিত্রে বিবর্তন সৃষ্টিতে পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র হিসাবে কিষ্টো বেদে গুরুত্বপূর্ণ। বেদে জীবন-প্যাটার্নে কিষ্টো বেদের জন্য অপরাধের নয় 'পরকীয়া প্রেম।' তার কঠিন সুশ্রী মুখ, চওড়া বুক, দুরন্ত সাহস রাধিকার মনেও নেশা ধরায়।

যৌবনদীপ্ত রাধিকার প্রতি গোপন আকর্ষণে কিষ্টো শম্ভুর ঈর্ষাবৃত্তি, রাধিকার প্রতিকূল আচরণ উপেক্ষা ক'রে তাদের বন্ধুত্ব কামনা ক'রে, মদ খাওয়ার আহ্বান জানায়। আকস্মিক ও নাট্যিক পরিণামে রাধিকার প্রেমসঙ্গী হয় এক নবযৌবন সম্পন্ন দীর্ঘদেহী দুরন্ত স্বভাবের পুরুষ কিষ্টো। কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন ধরাতে গিয়ে শম্ভুর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে আবারো রাধিকা পুড়িয়ে ছাই ক'রলো তার পশ্চাতের জীবনকে।

স্থবির শম্ভুকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ ক'রে, তার তাঁবুতে ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে কিষ্টোকে নিয়ে দেশান্তরে যাওয়ার সময় বেদেনী বলে 'মরুক বুড়া পুইড়্যা।' রহস্যময়ীর মতো ব'লেছে, 'থাক পর্যা, উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকাকে লিবা, উহাকে দাম দিবা না।' অশিক্ষিত, অন্ত্যজ বেদে নারীর চিরন্তন রহস্যময়ী রূপ, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, প্রবৃত্তির সমন্বয়ে 'বেদেনী' ব্রাত্যজীবনের অকপট বাস্তবতার অপরূপ শিল্প-প্রচেষ্টা।

মানুষের মনোমধ্যে শেকড়ায়িত কুসংস্কার যে কীভাবে ব্রাত্যজীবনকে প্রভাবিত ক'রেছে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ডাইনী' (*প্রবাসী,* আষাঢ়–১৩৪৭) গল্পটি। এতদ্বিষয়ক তারাশঙ্করের দু'টি গল্প— ডাইনী ও ডাইনীর বাঁশী। বিষয়ভিত্তিক মৌল তাৎপর্যের মিল থাকা সত্ত্বেও, এ গল্পের যোরধনী (সুরধনী) যেন জীবনবিরোধী প্রবৃত্তির আর একটু সুষম প্রকাশ। শিল্পীর সপ্রাণতায় অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন অমানবিক জীবন করুণ রসে অভিসিঞ্চিত হ'য়েছে। গল্পের স্বপক্ষে পরিবেশ কল্পনা করা হ'য়েছে নিষ্করুণ শুষ্ক ছাতি ফাটার মাঠ, "এপার হইতে ওপার অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়ার মোটেই অসম্ভব নয়।" এমনি নিঃসঙ্গ স্তব্ধতার মধ্যে একখানি কুঁড়ে ঘরে ডাইনীর বাস। এ গল্পে বীরভূমের শুষ্ক বালুকাময় ভূ-প্রকৃতি ও অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজস্থিত মানুষের প্রাগৈতিহাসিক চিন্তা-চেতনা প্রাণ পেয়েছে। বাগদি বাউরি চাষীদের জীবন সম্পর্কীয় চেতনা সংস্কারে আবদ্ধ। এই সমাজের-ই সৃষ্ট এবং ডাইনীকল্পিত অসহায় এক বৃদ্ধা নারী এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। জন্মসূত্রে যে কুসংস্কার অন্ত্যজ, ব্রাত্যসমাজ, বংশপরম্পরায় বহন ক'রে চ'লেছে, মানবতার সেই অবমাননা শিল্পসফল রূপ পেয়েছে গল্পটিতে।

এ গল্পের ডাইনী-কল্পিত নারীর স্মৃতিচারণা, মানবিক অনুভূতি সবকিছুই ডাইনী-সত্তার উর্ধ্বে স্বাভাবিক মানবসুলভ প্রবৃত্তি সমর্থিত। 'বৃদ্ধ বয়সে ন্যুব্জদেহ, পিঙ্গল দুটি চোখের তারা, দৃষ্টিতে ছুরির ধার' — কৈশোরের সৌন্দর্যময় লাবণ্যকে ঢেকে দিয়েছে। সুরধনী নামের সৌন্দর্যময়ী যে কিশোরী ডাইনী নামের অন্তরালে বিলীন হ'য়ে গেল, তার কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য কম ছিল না। খয়েরী রঙের চোখ

সৌন্দর্যের প্রতীক না হ'য়ে অসংস্কৃত, অশিক্ষিত মানুষের ভয়ার্তচিত্তে ডাইনীর চোখ ব'লে চিহ্নিত হ'ল। তখন থেকেই লোকে তাকে ভয় ক'রত। গল্পে বর্ণিত হারু সরকারের ছেলের মুড়ি-আম খেয়ে পেটের বেদনা, স্বজাতীয়া সমবয়সী সাবিত্রীর কচি ছেলের মৃত্যু, ভিক্ষায় বের হ'য়ে মাছ-বাজার-গন্ধে ব্যাকুল হওয়া ইত্যাদি ঘটনায় লোকে তাকে দায়ী ক'রে দূর দূর করত। লজ্জায় ভয়ে পালিয়ে বেড়াত সে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তার ব্যতিক্রমী দৈহিক সৌন্দর্য অন্ত্যজ সমাজের মানুষের চোখে অপবাদ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। মা-বাপ মরা, অনাথা, দরিদ্র ও ভিক্ষাজীবী একটা কিশোরীর ভালো খাবারের প্রতি আকর্ষণ থাকতেই পারে, সহজেই মাছ ভাজার লোভনীয় গন্ধে তার জিহ্বার নিচে লালা-নিঃসরণ বাস্তবনিষ্ঠ সত্য। বয়ঃসন্ধিক্ষণে দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের রাণার উপর দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ কিশোরী, কখনোই বিকৃত মানসিকতার হ'তে পারে না। সমাজ তাকে, তার দারিদ্র, একাকিত্ব, অবিভাবকহীন অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ডাইনীতে রূপান্তর ক'রেছে। মানুষের বার বার বলা কথায় অবচেতনে তারও একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে হয়তো বা সে ডাইনী, তা না হ'লে সত্যিই তো তার মনে এমন প্রতিক্রিয়া হবে কেন।

ডাইনী পরিচয়ে সুরধনী সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাণময়ী নারী। কিন্তু সমাজ-পেষণে তার সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তি নিঃশেষিত। বঞ্চিত, হতভাগ্য নারী তাই কখনো-কখনো ক্ষোভে, রোষে উন্মাদ। এটাই তার ডাইনী সত্তার প্রকাশিত সত্য। ছাতিফাটার মাঠ পার হওয়া তরুণী মায়ের পিপাসা নিবৃত্তির যে আয়োজন সে ক'রেছে তাতে সমাজবদ্ধ মানুষের আতিথেয়তার আন্তরিক ও স্বাভাবিক স্পৃহা স্পষ্ট। কিন্তু পুষ্ট, কচি লাউয়ের ডগার মতো নরম বাচ্চাটা দেখে তার কেমন যেন পরিবর্তন আসে। রৌদ্রে দগ্ধ, ঘর্মাক্ত বাচ্চা যেন তার-ই দৃষ্টির লালসায় নিঃশেষিত। সমাজ-সমর্থিত অপবাদ তার অবচেতন মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, মুহূর্তে তার মনে হয়— এ বাচ্চার মৃত্যুর জন্যে সেই দায়ী। সুরধনীর বয়সী নারী নাতি-নাতনী নিয়ে সংসার-মেলায় থাকে, এই মানবিক চেতনা-নিঃসঙ্গ, স্মৃতিপীড়িত সুরধনীকে উদ্দীপিত ক'রে বাউরি ছেলেটার সঙ্গে নাতি সম্পর্ক পাতাতে। কিন্তু ছেলেটির ভয়ার্ত সংস্কারের কাছে পরাজিত হয় তার এ মানবিক কামনা। পলায়নপর বাউরি ছেলেটি পায়ে হাড় ফুটে ধনুষ্টংকারে মারা গেল, অন্ত্যজ ও অশিক্ষিত বাউরি সমাজ তাকে ডাইনী দোষারোপে হত্যা ক'রতে উদ্যত হয়। পালাতে গিয়ে ডাইনীও ছাতিফাটার মাঠে ঝড়ের কবলে পড়ে করুণ মৃত্যুবরণ ক'রে।

'ডাইনী' গল্পের মূল-কথাবস্তু গ্রামীণ কুসংস্কার। একটা নারীকে ডাইনী ভেবে তার উপর যে অমানবিক অত্যাচার, তার-ই বিস্ময়কর শিল্পরূপ এ গল্পটি। তারাশঙ্করের ডাইনী আসলে সুরধনী নামের এক ডোম মেয়ে। তার ভিতর মাতৃত্ব, প্রেম, মমতা সব-ই আছে। সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষা, সংসারে বেঁচে থাকার আর্তি, আর দশটা স্বাভাবিক নারীর মতো নিরাপদ সামাজিক আশ্রয় তার কাম্য ছিল। কিন্তু 'মানুষের অন্ধ সংস্কার, তাকে ঘর বাঁধতে দেয়নি, তার মানবিক বৃত্তিকে ডাইনী ব'লে ক'রেছে অপমান।'[২৩] সমাজের উঁচু শ্রেণীর নারী কখনো ডাইনী আখ্যায়িত হয় না, হয় নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ নারী। অন্ত্যজ ব্রাত্য জীবনে, অন্ধসংস্কার এমনভাবে প্রোথিত যে, সুস্থ মানুষকে অমানবিক হননে মত্ত হয়। 'সমাজ-মানসের অবচেতন অন্ধকারে অবগাহন ক'রে, তারাশঙ্কর গভীরে মমতায় মানুষের অমানবিক আচরণে বিধ্বস্ত এক নারীকে এই গল্পে এঁকেছেন।'[২৪] এখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও মানবিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব নীচুতলার মানুষের জীবনাচরণ অবলম্বনে প্রতীকায়িত।

অন্ত্যজ জীবনের নিম্নতর স্তরেও ভালোবাসার সংরাগ বিচিত্র লীলায় অনুরণিত, তারাশঙ্করের 'কবি' তার-ই আস্বাদন। 'কবি' (*প্রবাসী*, কার্তিক ১৩৪৭) নিম্নবর্গীয় জীবনবিন্যাসে উচ্চমার্গীয় রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী। হাড়ির ছেলে স্বল্পশিক্ষিত নিতাইচরণের কবিরূপে আত্মপ্রকাশের মধ্যে গল্পের রসনিবিড় বুনট নিহিত ও ঘনীভূত। নিতাই স্টেশনে মোট বহনের কাজ ক'রে আর স্বভাব কবিয়ালের মতো গান বাঁধে, গান গায়। স্টেশনের লাইনম্যান রাজা, মুচি নিতাইয়ের বন্ধু। কুলির কাজ ক'রলেও নিতাই কথাবার্তা পোশাক-পারিপাট্যে স্বতন্ত্র। কবিত্ব-প্রতিভা প্রকাশ তাকে মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতায় সমাজ থেকে, মূলাশ্রয়ী জীবন থেকে উন্মূল ক'রেছে। কবি-গানের সভায় সমাদৃত হ'য়ে যেন তার গোত্রান্তর হ'ল। সে আর যেন দরিদ্র হাড়ি-সম্প্রদায়ের পরিচয়ে সীমায়িত নয়। উচ্চ বিত্তের মানুষের কাছে থেকে স্বীকৃতি স্বরূপ মেডেল পুরস্কার পেয়ে, অন্তর্ময় অনুভবে, আশ্চর্য এক কল্পনাজগতের দ্বারো—ঘাটন ঘটে নিতাইয়ের জীবনে। সে যেন ঐকান্তিক জীবন-দীক্ষায় সাধারণ্যের দৃষ্টিসীমার বাইরে এক নির্ভীক স্বপ্নচারী। হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরি প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ সাধারণতঃ চোর-ডাকাত, লাঠিয়াল ও ঠ্যাঙাড়ে পেশাধারী হ'য়ে থাকে। কিন্তু নিতাই হাড়ি-সমাজভুক্ত হ'লেও মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও হাড়িদের জাতিগত পেশাকে ঘৃণা ক'রে। সে নেশা-আসক্তও নয়। সে যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ "সে চুরি করে না, মিথ্যা বলে না, এই সংযম তাহার ভীষণ উগ্র। এই উগ্রতার জন্যই নিতাই আত্মীয়-স্বজন সকল জন হইতে বিচ্ছিন্ন।"

অবশেষে, নিতাই যাকে ভালোবাসে, সে ভিন্ন জাতের বিবাহিতা নারী। নিতাইয়ের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় ও সম্পর্ক রাজার সূত্র ধ'রে। 'মেয়েটি গ্রামান্তরের মুচির মেয়ে, দূর সম্পর্কে রাজার শ্যালিকা, সেই সম্পর্ক ধ'রে রাজাকে বলে জামাই, নিতাই তাকে বলে ঠাকুরঝি।' (ঠাকুরঝি দুধওয়ালির সঙ্গে নিতাইয়ের হৃদ্যতার ফলে ঠাকুরঝির পারিবারিক সংকট হয়। এখানে সমাজধর্ম অন্ত্যজ জীবনেও যে, সমস্যা সৃষ্টি ক'রে, সে পরিচয় স্পষ্ট। ঠাকুরঝি বিনামূল্যে নিতাইকে দুধ দেওয়ার অপরাধে স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। এই পরিণামের জন্য অনুতাপে যন্ত্রণাবিদ্ধ নিতাই ঠাকুরঝিকে বিবাহ করার ইঙ্গিত দেয় রাজাকে। এখানে নির্জলা প্রেম ও অসহায়ত্বের মমত্ববোধ দুই-ই কাজ ক'রে। নিতাই ঠাকুরঝিকে বিবাহ ক'রতে না পারার দ্বিধায় এক ধরনের হতাশাগ্রস্ততায় আক্রান্ত হয়। পরিণামে সে নিঃশব্দে ভালোবাসার মানুষের কল্যাণ কামনায় দূরে চ'লে যায়। ঠাকুরঝির প্রতি তার অতিমধুর প্রীতির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অতিপ্রিয় মেডেলটি সে ঠাকুরঝিকে উপহার দেয়। তার এ চ'লে যাওয়ায় ভালোবাসার বেদনা নিভৃতে আলো ছড়িয়েছে।

'ইমারত' গল্পটিতে (*আনন্দবাজার,* শারদীয়া ১৩৫২) নির্মাণ-শ্রমিকদের জীবনাচরণ, সমাজ-কাঠামোতে তাদের অবস্থান, সমাজের উঁচু-নীচুর বৈষম্যে তাদের শোষণ-বঞ্চনার কাহিনীচিত্র উন্মোচিত হ'য়েছে। জনাব সেখ এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে ঘিরে আবর্তিত হ'য়েছে নির্মাণ-শ্রমিক নারী-পুরুষের দল। আপাত দৃশ্যে এ গল্পে নারীদের নারীত্ব চরম লাঞ্ছনা-পীড়িত ব'লে মনে হ'লেও, সামাজিক ও আর্থিক মানদণ্ডে নারী-পুরুষ নিরাপদ আশ্রয়-সন্ধানে পারস্পরিকভাবে যুক্ত।

জনাব চরিত্রের অবৈধ প্রণয়লীলা পরিবেশগত ও অন্ত্যজ সমাজ-সম্ভব বাস্তবতায় বিদ্যমান। শুধু, রাজমিস্ত্রী হিসাবেই দক্ষ নয় তারাশঙ্করের নির্মাণশৈলী ও দক্ষতার জন্য জনাব সেখ অন্ত্যজশ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে বাস্তবসম্মত। অসাধারণ মিস্ত্রী জনাব উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী।

জনাব শুধু ইমারতশিল্পীই নয়, সৌন্দর্য-পিপাসু জনাব জীবনশিল্পীও। তার চেহারার বর্ণনাও আছে লেখকের বর্ণনার কারুকাজ- 'মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ও লংয়ের সূতোয় পাকানো সরু দড়িটির মতো সাদা এবং সোজা, বাবরি কাটা চুলগুলি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো, কর্ণি দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তরার মতো চকচক ক'রছে।' জনাব শুধু ইমারতের কারুকাজ-ই জানে না, কথার কারুকাজও তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্যামাদাস বাবুর মন্দির তৈরির প্রসঙ্গে কৃপণের মধ্যে

সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি ক'রে, সে কথার কারুকাজে— 'মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল, আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে খাড়া থাকবে। সরুযের আলো পড়ে সোনার কলস ঝলবে।' খরচের কথা ভেবে আতঙ্কিত শ্যামাদাসকে সে যেন সহজ কবির কাব্যস্বপ্ন দেখায়। সৃষ্টি-প্রেরণায় শিল্পীসত্তার অসাম্প্রদায়িক বিরল প্রকাশ জনাব চরিত্রে রূপান্বিত।

এ গল্পে সমাজ পরিসরে নিম্নশ্রেণী থেকে তুলে এনেছেন লেখক জনাব চরিত্রটি। এরা শুধু সমাজকে দিয়েই যায়, সমাজের উচ্চ-বর্ণ-চিত্তের কাছে এরা শোষিত ও বঞ্চিত। যে জনাব সেখের হাতের ছোঁয়ায় গ'ড়ে ওঠে আকাশচুম্বী শৌখীন ইমারত, তার ঘরের ইতিহাস বড় অদ্ভুত। 'মাটির দেওয়ালে ভাঙা ঘর, সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে।' হয়তো বা এভাবেই মিটিয়েছে তার সুন্দর আবাসের চিরন্তন সাধ। শেষ বয়সে সাঁওতাল পরগণা থেকে ব্যভিচারী জীবনের চিরসঙ্গী ব্যাধি নিয়ে ফিরে এসে দেখে, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইও তার অবশিষ্ট নেই। রসিদ ও তার পিতার কুটিল ষড়যন্ত্রে ভিটেমাটি থেকেও সে উন্মূল। শক্তিমানের অত্যাচার, জমিদারের পীড়নে নিম্নবিত্ত মানুষের যে অতলান্তিক ভোগান্তি, তার প্রতিনিধি হিসাবেও জনাব সেখকে নির্বাচন করা যায়। এ ইমারতশিল্পীর পৃথিবীতে কোনো ঘর থাকে না, থাকে শুধু খোদাতায়ালার গড়া ইমারত পত্রবহুল বুড়ো বটের তলা, যা থেকে কেউ তাকে উন্মূল ক'রতে পারবে না।

নীচুতলার মানুষের প্রেম-ভালোবাসার নিবিড় প্রকাশ 'একটি প্রেমের গল্প' (*অমৃত*, পূজাসংখ্যা ১৩৭১)। আদিবাসী সাঁওতাল মেয়ের স্বভাবজাত আদিমতা, হিংস্রতা, সরলতা ও পরিবেশগত স্বধর্ম থেকে উত্তরণ গল্পটির রসাবেদনের ভিত্তি।

দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী কালো মেয়ে ফুলমণি। লেখকের বর্ণনায় 'সুন্দর তার দুটি চোখ। চোখের সৌন্দর্য, তার বোবা সৌন্দর্য নয়, সে সৌন্দর্য কথা কয়। মুখখানি তার এমন মনোহারিণী ছন্দময়ী দেহের থেকেও সুন্দর।' বোগেনভেলিয়া ফুল মাথায় দিয়ে যখন সে মজুর-খাটতে যায়, তখন সে সত্যিই অপরূপা। সাঁওতাল সুন্দরী ফুলমণির দিকে অনেকের নজর প'ড়লেও, সে ভালোবাসে বুধনকে। বীরত্বের প্রতি সহজাত আকর্ষণ থেকে, সে মুগ্ধ হ'য়েছিল বুধনের বীরত্বে। সমাজ-নির্দেশিত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওদের বিবাহও নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। এ সময় থেকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র ফুলমণির জীবনে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। অন্ত্যজ সমাজের নিস্তরঙ্গ সাঁওতাল পাড়া গল্পের পটভূমি হ'লেও, নাগরিক জীবনের কোর্ট-কাছারি, সভ্যসমাজে পদার্পণ ইত্যাদি সামূহিক

বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় গল্পের পরিমিত পরিসরে। ফুলমণির নারীত্বের অবমাননা, অহংবোধ, প্রিয়ের প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠা, চরিত্রটিকে বহুমাত্রিকও মর্মস্পর্শী ক'রেছে। তার হবুস্বামী যখন হাসির নাগরিক চতুরালি ও ছলাকলায় ভুলে তার থেকে দূরত্বে চ'লে যায়, তখন ফুলমণি সহজে মেনে নেয়নি নারীত্বের এ পরাজয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বেরিয়ে শহরের সাজ-সজ্জা ও মদ পর্যন্ত ধ'রল। প্রেমাস্পদকে ফিরে পাওয়ার জন্য সে যেন ত্রিভুজ প্রেমের প্রতিযোগিতায় নেমে প'ড়ল। হাসি-বুধন-ফুলমণির ত্রয়ী প্রেমের সংকটে প্রেম-প্রত্যাখ্যাত সাঁওতাল মেয়ে সইতে পারল না প্রেমের অপমান। অবশেষে, প্রকৃতির মতো সরল অথচ প্রয়োজনে প্রকৃতির মতোই নিষ্ঠুর সাঁওতাল মেয়ে আহতা ফণিনীর মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে উঠল। অহংবোধে উদ্দীপ্ত নারী-চরিত্র ফুলমণি এ গল্পে নাট্যিক কৌশলে চিত্রায়িত।

অন্ত্যজ, ব্রাত্য নারী ফুলমণির অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘ'টেছে গল্পাংশে। প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার বেদনা চরিতার্থ করার জন্য সে বুধন-হাসিকে হত্যা ক'রতে গিয়েও পারেনি। 'যেন প্রেম নাহি মানে পরাভব' প্রণয়াবেগের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা যদি না হয়, তবে কী প্রয়োজন তাদের জীবন থেকে সরিয়ে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এ গল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ। কোথা থেকে কী হ'য়ে গেল। ফুলমণি ওদের অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন অবস্থায় দেখে, আত্ম-শ্লাঘায় কাটারি নিজের গলায় বসিয়ে দিল। ভালোবাসার প্রতিষ্ঠাহীন জীবন তার কাছে ব্যর্থ মনে হ'য়েছে, তবু সে হাসি-বুধনকে হত্যা ক'রতে পারেনি। উন্মত্ত হিংসা নিভে গেছে কষ্টের অশ্রুজলে। কারণ, বুধনকে সত্যিই সে ভালোবেসেছিল।

তারাশঙ্কর, তাঁর ছোটগল্পে ব্রাত্য-অন্ত্যজশ্রেণীকে পরম মূল্য দিয়েছেন। ফলে, সাঁওতাল মেয়ে ফুলমণি সমাজ-পরিবেশ, স্বভাবজাত ঈর্ষা-হিংসা ও বক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রেমের অনন্য উদাহরণ।

গল্পের শেষাংশে ফুলমণির প্রেম মহত্তর স্তরে প্রতিষ্ঠিত। হাসি মারা গিয়েছে, মাতাল, রোগাক্রান্ত বুধন ও তার পাঁচ সন্তান সেবিকা ফুলমণির উপার্জিত অর্থের উপর নির্ভরশীল। ফুলমণি এখানে আত্ম-নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব রূপে প্রকাশিত। ঈর্ষাহীন, ক্ষোভহীন ভালোবাসার এমন সমুন্নত রূপ সাঁওতাল জনোচিত নয়। তবু ব্রাত্যজীবনের হৃদয়বোধকে তারাশঙ্কর, মনোলৌকিক রহস্যময় স্তরে উপস্থাপন ক'রেছেন।

বিচিত্র চরিত্র-স্রষ্টা তারাশঙ্করের অসামান্য ছোটগল্প 'মাটি' (*যুগান্তর*, শারদীয়া ১৩৫৬)। মৃত্তিকাসম্ভব জনজীবন, জীবনতরঙ্গ, সামাজিক অবিচার, আর্থিক বিনষ্টি,

বাঙ্গালার কোমল পলিমাটির ভারসাম্যের অন্তরঙ্গসূত্র 'মাটি' গল্পে সংলগ্ন। গল্পের নায়ক জীওনলাল পৈতৃক সম্পত্তি-বঞ্চিত, উন্মূল এক মাটিওয়ালা। জীওনলাল শোষকশ্রেণীর নির্মাণ, শোষণ-পীড়নে পিষ্ট-জর্জরিত নিঃস্ব মানুষ। সমাজসতর্ক তারাশঙ্কর মনুষ্যত্বহীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতারণার ফলে আর্থ-সামাজিক সংকটতাড়িত বিপন্ন জীওনলালকে 'মাটি' গল্পে সার্থক রূপদান ক'রেছেন। একসময় তার সব-ই ছিল। জমিদার, তার ঘুষখোর তহসিলদার, পাইক-পেয়াদার ষড়যন্ত্রে ও আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রদানবের কারণে সে সর্বহারা হ'য়েছে। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, জমিদারতান্ত্রিক সমাজব্যস্থায় নিম্নবিত্ত, ব্রাত্য মানুষের অসহনীয় ভোগান্তি অন্যায়-অবিচারে জেলবাস ইত্যাদি এ গল্পে এক কারণ– তাৎপর্যে সমৃদ্ধ।

রতনলাল মারা যাওয়ার পর, তার জমি স্টীমার কোম্পানি অধিগ্রহণ ক'রে। জমিদারের বন্দোবস্তের জমি থেকে তার ছেলে জীওনলাল বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনা মাটিপ্রেমিক জীওনলালের জীবনের ছক যেন ওলট-পালট ক'রে দেয়। নিঃস্ব, হতদরিদ্র ও উন্মূল জীওনলালের সমস্যাদীর্ণ দুঃখের দিনে তার ক্ষেতের মজুর, অকলুমুসহরের কন্যা ছিল ব্যথার দোসর। জমি হারিয়ে, মামলায় হেরে গিয়ে, সমস্ত অর্থও তার নিঃশেষ হ'য়ে যায়। একাকিত্বের বেদনায়, সব-হারানোর কষ্টে ও মানসিক উদ্ভ্রান্তিতে জীওনলাল পাগলের মতো কাঁদে। তখন তার একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল অকলুমুসহর-কন্যা লছমনিয়া, সমাজ যারে নাম দিয়েছে সাপিনী কন্যা। গঙ্গাতীরে গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে জীওনলাল ভুলক্রমে বাঁধ কেটে ফেলে। ফলে, আইনের বিচারে তার পাঁচ বছরের ও লছমনিয়ার দুই বছরের জেল হয়। ইতোমধ্যে বিপদের বন্ধু, নিঃসঙ্গ জীবনের সান্ত্বনার আশ্রয়, লছমনিয়াকে সে ভালোবেসেছে ঐকান্তিক প্রেরণায়। যে তার সুখে-দুঃখে একান্ত সঙ্গিনী, তাকে সমাজধর্মের বাধা সত্ত্বেও জীওনলাল বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে লছমনিয়া তখন এক সাহেবের আয়া। যে জাহাজ কোম্পানি জীওনলালের জীবনকে ক'রেছে অসহায়, জর্জরিত; সেখানে এক সাহেবের বাসায় চাকুরি ক'রে লছমনিয়া। সাহেবের অবৈধ সন্তানের জননী সে। জীওনলাল, লছমনিয়ার অতি প্রিয় মেওয়ালালজী আশ্চর্য চোখে দেখল তার মুসহরদের সাপিন কন্যা, 'পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মতো লম্বা আর মেজাজী' লছমনিয়াকে। লছমনিয়া তাকে ব'লল, 'সাহেব আমাকে দিয়েছে, আমার নিজের ছেলে, জীওনকে আধিয়ারা রাতের চাঁদ।' তার নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে জীওনলাল বিস্মিত হ'য়েছে, কিন্তু রাগ করেনি। সে তার ভালোবাসার মানুষের মনে, তার পিয়ারীর মনে তো কষ্ট দিতে পারে না। তাছাড়া, যে

সমাজে নারীর কোনো ব্যক্তি-মূল্য নেই, যে কেবল-ই ভোগের সামগ্রী, এভাবে অবৈধ সন্তানের মা হওয়া ছাড়া বিকল্প আর কী সে পেতে পারতো। পিতৃহীন, স্বামী-পরিত্যক্ত, পাঞ্জাব সমাজে সাপিন-কন্যা ব'লে পরিচিত লছমনিয়া জীবিকার জন্যে যেখানেই থাক না কেন, সম্ভ্রম-লুণ্ঠিত হ'তে পারত। পঙ্কিল সমাজ ও নারীর অমর্যাদাকর অবস্থানের প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত ক'রেছেন লেখক এ গল্পে। পুরুষপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থায়, সাহেবের রক্ষিতা হওয়ার মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠুর ও অমানবিক চেতনার স্বরূপ উন্মোচিত। সামাজিক পরিচয় ও আর্থিক মূল্যায়নে নিম্নশ্রেণীর নারীর অবস্থান এভাবে নির্ণীত ও চিহ্নিত।

'মাটি' গল্পের মেওয়ালাল, মাটির মমতায় চরম মূল্য দিয়েছে। তার জমি গেছে, ঘর গেছে, পিয়ারী লছমনিয়া স্টীমার কোম্পানির সাহেবের রক্ষিতা। তবু পিয়ারীর খুশি মুখ দেখে, এক অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব ক'রেছে মেওয়ালাল। এখন সে কলকাতার মাটিওয়ালা মেওয়ালাল। 'নুয়ে পড়া ঘাড় এবং ঠেলে ওঠা পিঠের কুঁজের মধ্যবর্তী খাঁজে মাটির বস্তা ভ'রে বিকলাঙ্গ মাটিওয়ালা সর্বাঙ্গে কাঁদা মেখে হেঁকে চলছে — মাটি চাই, মাটি-ই।' পাটনার মাটির সন্তান জীওনলাল, পরিশ্রমী টগবগে যুবক এখন মাটি ব'য়ে বেড়াতে বেড়াতে বিকলাঙ্গ দেহ মাটিওয়ালা মেওয়ালাল, লছমনিয়ার পিয়ারের মেওয়ালাল নয়। জীবনের করুণ আর্তি কিছুটা হ'লেও ভুলিয়ে দিয়েছে মাটি। গঙ্গার সন্তান জীওনলালকে গঙ্গাই পথ দেখিয়ে দিল। ভাটার গঙ্গা থেকে পলিমাটি তুলে নিয়ে জীওনলাল ফিরে পেল, তার হারানো মাটিকে। এত কিছুর পরেও সে কিন্তু ভালোবাসাকে ভোলেনি। লছমনিয়ার প্রতি সে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন ক'রে আসছে কষ্টার্জিত অর্থ থেকে প্রতিমাসে দশটি টাকা পাঠিয়ে। এমনকি, তার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা— 'লছমনিয়া পেয়েছে তার ছেলেকে, আমার তো মুসহরের বেটাই সব। ওকে পাঠিয়ে যা থাকছে, তাও মরবার আগে মুসহরের বিটীয়াকে পাঠিয়ে দেব।' লছমনিয়া অন্যের অঙ্কশায়িনী, তবু এমন নিঃস্ব ভালোবাসার প্রকাশ বিরল।

তারাশঙ্করের প্রতিনিধিত্বশীল ছোটগল্পগুলো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় দেখা যায়, অন্ত্যজ ব্রাত্য জীবনধারা, বিশ্বাস-সংস্কার, উচ্চবর্ণ ও উচ্চ বিত্তের সামাজিক মানুষের শোষণ-পীড়ন, আদিবাসীদের টোটেম ইত্যাদি পরিপূর্ণ জীবন-ভাবনায় ব্যাপ্ত। এ জীবনের বৈচিত্র্য, সত্যসন্ধ জীবনদৃষ্টি, দারিদ্র্য, মানবীয় প্রাপ্তির সুখ-দুঃখ, তিনি দ্বিধাহীন ও সংশয়মুক্ত হ'য়ে উপলব্ধি ক'রেছেন। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের সঙ্গে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, নীচুতলার মানুষের জীবনতৃষ্ণার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যে

ব্রাত্যশ্রেণী সনমর্যাদা পেল। বিশেষভাবে রাঢ়বাংলার অন্ত্যজশ্রেণীর বহুধানিষিক্ত জীবন তিনি সমাজ-ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। সুস্থিত মানবজীবন, সতেজ জীবনানুভূতি, প্রকৃত অর্থে তাঁর ছোটগল্পে শুভ ও কল্যাণে ব্যঞ্জিত। তাই স্থানিক বলয় উত্তীর্ণ হ'য়ে সদর্থে সারা বাংলার কথাকোবিদের মর্যাদায় তিনি সম্ভাষিত। যাদের কথা কেউ বলেনি, তাদের কথা তিনি ব'লেছেন। তারাশঙ্করের শিল্পীমানস সূক্ষ্ম সাংকেতিকতায় সর্বত্র উপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে পুনরাবৃত্তি ঘ'টেছে, তবে তা বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় ও রচনার শিল্পগুণে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে। যথার্থ ও নির্মোহ বাস্তবতার রূপায়ণ সাহিত্যিকের অন্বিষ্ট। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নীচুতলার মানুষের মর্মমূলে পৌঁছে, মানবিক শুশ্রূষায় তাদের জীবনবৈচিত্র্য বাস্তবসমন্বিত ক'রে পরিস্ফুট ক'রেছেন। তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত অন্ত্যজ ও ব্রাত্যশ্রেণী, চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যে, সমাজসম্ভব বাস্তবতায় ও মনোলৌকিক শুদ্ধতায় ব্যাপক সহানুভূতি লাভে সমর্থ।

তথ্যনির্দেশ

১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা- ১৯৯৯, পৃ-২৪১

২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক (অবসর, ঢাকা ১৯৯৮), দ্র. 'প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই। এই ধ্বজার রীতিমতো পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়।' পৃ-১৩২

৩ অজয় রায়, বাঙালা ও বাঙালী সমাজ, বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ- ১৯৭৭, পৃ-৫৫-৫৬

৪ জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, ১৯৭৫, সম্পাদকীয়, পৃ-৬১

৫ রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে শূদ্র (কে পি বাগচী এন্ড কোং, কলিকাতা- ১৯৮৯), পৃ-৪৫-৪৮

৬ প্রাচীন ভারতে শূদ্র, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৩

৭ বাঙলা ও বাঙালীসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫

৮ প্রাচীন ভারতে শূদ্র, প্রাগুক্ত, (পরিশিষ্ট-২), পৃ-৩০১

৯ ঐ, পৃ-৩০৩

১০ সৈয়দ আজিজুল হক। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী : জীবন তৃষ্ণাই মূলকথা', বাংলা একাডেমী পত্রিকা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০৫), পৃ-৭৬

১১ কালের পুত্তলিকা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪১

১২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের উদ্ধৃতিসমূহ জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ-১৯৭৫); দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৬); তৃতীয় খণ্ড (১৯৭৭) থেকে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

১৩ বীরেন্দ্র দত্ত বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৯৫), পৃ-২০০

১৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্পবিচিত্রা- (প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৩৬৪), পৃ-৭১

১৫ কালের পুত্তলিকা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫০

১৬ বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ-৩১২

১৮ কালের পুত্তলিকা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৯

১৯ বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রাগুক্ত, পৃ-২১২

২০ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-২১৩

২১ তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড, সম্পাদকীয়), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯

২২ বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮০

২৩ ঐ, পৃ-২২৩

২৪ ঐ, পৃ-২২৪